শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

হারাবেন না

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
অনূদিত

ধৈর্য হারাবেন না

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূ।চি।পা।ত্র

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। জন্ম ৭ই জুন ১৯৬০ সালে (৩০ ডিসেম্বর ১৩৮০ হিজরি)। জন্মের আগে তার মা-বাবা ছিলেন সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে। অভাব অনটনের মাঝেই চলছিল তাদের সংসার। কোন এক কারণে বেশি দিন থাকতে পারেনি আলেপ্পো শহরে। পাড়ি দিতে হয় সৌদি আরবে। সৌদি আরবেই তার জন্ম। ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। এই ছোট্ট শিশুই আজ 'দাঈ ইলাল্লাহ' হিসেবে আরব বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। মানুষকে আহবান করে সরল সঠিক পথে। এতেই গাত্রদাহ শুরু হয় তথাকথিত প্রগতিশীলদের মানসপটে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং যাঁর ঠিকানা হয় বর্তমান সৌদি সরকারের বন্দিশালায়।

শিক্ষাজীবন

শিক্ষাজীবন শুরু হয় সৌদির রাজধানী রিয়াদে। প্রাথমিক, জুনিয়র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় এখানেরই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর সৌদি আরবেরই 'দাহরান' শহরে অবস্থিত 'কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি' থেকে 'ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে সম্মানের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ইসলামি ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন, শাইখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল জিবরিন-এর নিকট। তবে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান শাইখ আব্দুর রহমান নাসির আল বাররাকের সংস্পর্শে। সমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শেখেন শাইখ সাঈদ আল আব্দুল্লাহ-এর মুখে। আরও যেসব শাইখদের নিকট জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তাদের কয়েকজন হলেন—শাইখ সালেহ ফাওজান আল ফাওজান, শাইখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ ওলিদ সিদি আল হাবিব আশ শানকিতি, শাইখ আব্দুল্লাহ মুহদিস আজ জামিল, শাইখ আব্দুর রহমান সালেহ আল মাহমুদ প্রমুখ। এ ছাড়াও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. এর নিকট। তাঁরই সান্নিধ্যে থাকেন প্রায় দীর্ঘ পনের বছর। ইনিই হলেন তিনি—যিনি তাঁকে দ্বীনি শিক্ষা ও দাঈ ইলাল্লাহ-এর কাজে লেগে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইনিই হলেন তিনি—যিনি তাঁর জন্য দাম্মামের 'দাওয়াহ ও ইরশাদ' বিভাগে নিযুক্তির সুপারিশ করেন। ইনিই হলেন তিনি—যিনি ভাষণ দান ও খুতবা প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দানের জন্যও সেখানকার কর্মকর্তাদের নিকট চিঠি লেখেন। এই শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায

রহ.-এর প্রচেষ্টাই তিনি বর্তমান আরব বিশ্বের সামনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন খতিব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন।

বর্তমানে তিনি 'আল খুবার' শহরের 'মসজিদে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ'-এ ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এবং বিভিন্ন সময়ে সর্বোচ্চ স্কলারদের সম্মুখেও ইসলামিক লেকচার পেশ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের ক্লাসও নেন। যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন তন্মধ্যে রয়েছে তাফসির ইবনে কাসির, শরহে সহিহ বুখারি, ফতোয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা, শরহে সুনানে আত তিরমিযি, শরহে কিতাব আত তাওহিদ লিস শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব।

'আল কুরআনুল কারিম' চ্যানেলে শাইখ দুটি অনুষ্ঠান করেন। একটির নাম—'বাইনান নবি ﷺ ওয়া আসহা-বিহী-' আর দ্বিতীয়টির নাম—'খুতুবাত আলা তারিকিল ইসলাম'। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য টিভিতেও অনুষ্ঠান করে থাকেন। নন্দিত এই আরবি সাহিত্যিক শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ নন্দিত বক্তা হিসেবেও পরিচিত আরব বিশ্বের নিকট। তাঁর বক্তৃতার অনেক অডিও-ভিডিও ইন্টারনেটমাধ্যম গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব, মোবাইল এ্যাপসহ সর্বত্রই পাওয়া যায়। যেগুলো শ্রবণে মুসলমানদের ইমান জাগ্রত হয় নব উদ্যমে। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক ইসলামিক ওয়েবসাইট [Islamqa.info] চালু করেন ১৯৬৬ ইং সনে [উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, এটিই আরব বিশ্বের প্রথম ইসলাম বিষয়ক ওয়েবসাইট। তবে সৌদি সরকার ২০১০ সালে কয়েক বছরের জন্য এটির সম্প্রচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখে]। তবে এখন চলমান রয়েছে। এছাড়াও তিনি ইসলাম বিষয়ক ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্ম Islam Web Site-রও সিইও। যেখান থেকে আটটি ওয়েবসাইট পরিচালিত হয়। তিনি জাদ গ্রুপেরও সিইও। যে সংস্থাটি ইসলামিক শিক্ষা ও দাওয়াহ বিষয়ক মুঠোফোন ও টেলিফোন কন্টেন্ট তৈরি করে, টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার এবং ইসলামিক বই প্রকাশনার কাজও করে থাকে।

লেখনীর মাধ্যমেও শাইখ দাওয়াতের অনেক কাজ করে থাকেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেগুলোর প্রত্যেকটিই পাঠকপ্রিয়তায় বেস্ট সেলার হিসেবে খ্যাত হয়েছে। বক্ষমান গ্রন্থটিও লেখকের অনন্য গ্রন্থের একটি। এই গ্রন্থটি পৃথিবির বিভিন্ন ভাষায় হয়েছে ভাষান্তর। তাই আমরাও রূপান্তর করলাম বাংলাভাষীদের জন্য বাংলায় 'ধৈর্য হারাবেন না' নামে।

অনুবাদকের কথা

মানুষের জীবন স্থির নয়। নানা রকম সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশা আসবে জীবনে এটাই স্বাভাবিক। কখনও তা অনেক বড় হয়ে আসে আবার কখনো ছোট হয়ে। সবসময় রবকে স্মরণ করতে হবে। জীবন নদীতে অনেক সময় হঠাৎ করে মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়ে যায়। এটা হয় রবের পক্ষ থেকে। রব তাঁর বান্দাদেরকে দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি বান্দাদেরকে ধৈর্যশীল দেখতে চান। ধৈর্যধারণের পুরস্কার রব নিজ হাতেই দেন। এর জন্য শুধু প্রয়োজন 'সবর'। জীবন নদীতে দুঃখের ঢেউয়ে সবরের বৈঠা ধরেই পেতে হবে মহান রবের সেই মহা পুরস্কার।

আসলে মানুষের জীবনটা রাত-দিনের আবর্তনের মতোই। যেমন রাতের পর ভোর, ভোর শেষে সন্ধ্যা। এই নিয়ম কেবল গণনার জন্যই নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। পৃথিবির আঁধারকে আমরা বলি রাত আর আলোকে বলি দিন। তেমনি জীবন-আঁধারের নাম হলো—'মুসিবত, দুঃখ, কষ্ট'। আর আলোর নাম হলো—'সুখ, হাসি, আনন্দ'। পৃথিবির সময় যেমন দিন-রাতের আবর্তে চলছে, তেমনি জীবন-ঘুড়ি ও বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দের বাতাসে উড়ছে। কখনো কষ্টের কালো মেঘ এসে সব সুখকে মুহূর্তেই বিষাদে পরিণত করে দেয়, আবার কখনো সুখ ও আনন্দের এক পশলা বৃষ্টি ঝড়ে দুঃখের চিহ্নটুকু ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়। যারা বুদ্ধিমান তারা কখনোই দুঃখ-কষ্টকে দেখে বিচলিত হন না। পেরেশানও হন না। তারা ধৈর্যধারণ করেন। মহান রবের কাছে সুখের সোনালি ভোরের প্রত্যাশায় চোখ ও বুক ভিজিয়ে দোয়া করতে থাকেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের দমন-পীড়ন থেকে।" [সহিহ বুখারি : ২৮৯৩]

সত্যিকার মুমিনরা বিপদে কখনো হতাশ হন না। তারা বিশ্বাস করেন, রবের এ পরীক্ষা একদিন শেষ হবেই। হতাশার কালো মেঘ দূর করে একদিন রবই

সুখ দিবেন। তাই তারা ধৈর্যধারণ করে দুঃখ-দুর্দশায় স্থির থাকেন। ঐশীবাণী কুরআনুল কারিমে সে কথাই উচ্চারিত হয়েছে বারবার। মহান আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

"অবশ্যই দুঃখের সাথে সুখ আছে। অবশ্যই দুঃখের সাথেই সুখ রয়েছে।" [সুরা আলাম নাশরাহ : ৫-৬]

দুঃখের পাহাড় দেখে যারা ভেঙ্গে পড়েন, কষ্টের ভয়াল রূপ দেখে যারা মুষড়ে যান, তাদের জন্য উপরোক্ত আয়াত দুটি খোরাক জোগাবে। আশার আলো দেখাবে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেন-

"ঈমানদারদের জীবন ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয় তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ ও তাদের পাপকে মোচন করানোর জন্য। কারণ ঈমানদারগণ তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কেবল রবের সন্তুষ্টির জন্য করেন। তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার দেয়া রবের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।" [মাজমু'উল ফাতাওয়া : ১৮/২৯১]

সত্যি বলতে কি! কোন মুসিবত বা দুঃখই চিরস্থায়ী নয়। যেমন চিরস্থায়ী নয় রাতের আঁধার, আকাশের কালো মেঘ, চাঁদ ঢাকা অমাবস্যা। প্রকৃতির এসব বিষয় নিয়েও যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে, তবে খুব সহজেই সে বুঝতে পারবে—আজ যে কষ্টের কালো মেঘ আমার জীবনে ছেয়ে গেছে, কাল-ই সেখানে সুর্যের আলো লুটোপুটি খাবে। সুখ আর আনন্দের হাওয়া বইবে। অনেকেই দুঃখের ঢেউ দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। কষ্টের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। আর কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে পাপের পথে পা বাড়ান। এসব কোনোটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বুদ্ধিমানের কাজ হলো—ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। শত কষ্টেও আশায় বুক বাঁধা। বিশ্বাস রাখা যে, একদিন এ অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর আসবেই। দুঃখের সময় রবের কাছে প্রার্থনা করা। এ সবকই দিয়েছেন মহান রব। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সুরা বাকারা : ১৫৩]

প্রিয় পাঠক,

বইটির সাথে পরিচয় হওয়ার আগে আপনার সাথে অনেক কথা বলে ফেললাম। তাহলে চলুন—এবার বই সম্পর্কে আপনার সাথে কিছু আলাপ হয়ে যাক। "ধৈর্য হারাবেন না" নামে এখন আমরা যে বইটি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি; তা মূলত নন্দিত লেখক ও দাঈ শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ্ রচিত "সিলসিলাতু আমালুল কুলুব"-এর একটি অংশ "আস সবর"-এর বাংলা অনুবাদ।

বইটি ছোট্ট, কিন্তু লেখকের প্রতিটি কথাই যেন হীরাতুল্য। বইটি প্রথমত আমি নিজের জন্যই অনুবাদ করেছি। কারণ আমি নিজেই কোন দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হলে স্থির থাকতে পারি না। আশা করি এ বইটিও আমাকে রবের পক্ষ থেকে পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করতে পথ দেখাবে। দীপ্ত আলোর মশাল হয়ে আমার জীবনে আলো ছড়াবে। দোআ করবেন, আমি যেন ধৈর্যধারণ করে রবের মহা-পুরস্কার পাই। আর যদি আমার কোন ভাই-বোন বইটি পড়ে দুঃখের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারে, তাহলে হয়ত রব আমাকে এর প্রতিদানও দিবেন। বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি কিছু নীতিমালা অবলম্বণ করেছি। সেগুলো হলো:

১. অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্বতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। তাই কোথাও পাঠস্বাদ না হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

২. টিকায় প্রত্যেকটি আয়াতের সুরার নাম, আয়াত নং এবং হাদিসের উৎস বলে দিয়েছি। আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে মূল আরবিপাঠ উল্লেখ করে দিয়েছি, তবে সহজার্থে কিছু কিছু হাদিসের আরবিপাঠ উল্লেখ করা হয়নি।

৩. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে যত নুসখা রয়েছে, সবগুলোকেই আমি সামনে রেখেছি। যাতে লেখকের হীরাতুল্য কোন বক্তব্যই হারিয়ে না যায়।

৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সাবলীল রাখতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। তাছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই আপনাদের চোখে যে ভুলগুলো ধরা পড়লে অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করবো ইনশা আল্লাহ।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন ইসলামি জগতের স্বনামধন্য প্রকাশনা 'পথিক প্রকাশন'। আল্লাহ তা'আলা প্রকাশককে এবং এই বইটির পিছনে যারা দিন-রাত মেহনত করেছেন, তাঁদের সবাইকে এর উসিলা করে পরপারে নাজাত দিন এবং জান্নাতের সুখময় উদ্যানে জায়গা করে দিন। আমিন।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই রবের, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

মানুষ যেসকল গুণের সূত্র ধরে পৌঁছতে পারে উৎকর্ষতার শীর্ষচূড়ায়—তার মধ্যে অন্যতম হলো সবর বা ধৈর্য। এটি এমন একটি বিষয়, যাকে অবলম্বন করে আল্লাহ ﷻ বান্দাকে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সবরের গুণ একজন মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। তাকে সহায়তা করে অনেক অনেক দূরে অগ্রসর হতে। তাকে সাহস যোগায় কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে।

এই গুণটি অর্জন করার কথা কুরআনে যেমন এসেছে, তেমনি বিভিন্ন হাদিসেও প্রিয়নবি ﷺ-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিজে সবর অবলম্বণ করার মাধ্যমে বলার পাশাপাশি করার মাধ্যমেও উম্মতের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তাঁর পুরোটা জীবনেই ছড়িয়ে আছে সবরের শিক্ষা। এমনিভাবে পরবর্তীতে প্রতি যুগের উলামাগণও সবরের প্রতি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই গুণের প্রতি তাদেরকে ধাবিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এর জন্য তারা বেছে নিয়েছিলেন ওয়াজ-খুতবা এবং কালি-কলমকে।

বর্তমান সময়ের বিদগ্ধ আলেম ও বহু প্রতিভার অধিকারী শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ-ও সেই ধারাবাহিকতায় রচনা করেছেন সবর সংক্রান্ত এই পুস্তিকাটি। যেখানে তিনি সবরের পরিচয় ও এর প্রকারভেদ, সবরের ফলাফল ও এর নানান দিক সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। কলমের আঁচড়ে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন নবি, সাহাবি, তাবেয়ী ও তাবেতাবিয়ীসহ পরবর্তী ইমামদের জীবনে সবরের উপস্থিতির চিত্র ও ঘটনাবলী। যার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ খুব সহজেই সব অবলম্বনের প্রতি ধাবিত হবে।

ধৈর্য হারাবেন না

বইটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার খেদমতটি আঞ্জাম দিয়েছেন আমার সহপাঠী মুফতি সাইফুল্লাহ মাহমুদ। আল্লাহ ﷻ তার কলম ও কলবকে যোগ্যতার আলো দ্বারা ভরপুর করে দিন। মূলত তার অনুরোধেই অনূদিত পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করার সুযোগ হয়েছে আমার। এমন একটি মহৎ কাজে নিজেকে অংশীদার করতে পেরে আল্লাহ ﷻ-র দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এই শ্রমগুলো যাতে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে থেকে যায় যুগের পর যুগ, এর মাধ্যমে যেন আল্লাহ ﷻ পরকালে পার পাওয়ার পরওয়ানা জারি করেন সেই কামনা করছি।

বইটির অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট আরো যারা এর পেছনে সময়-শ্রম দিয়ে একে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন সকলের খেদমতকে আল্লাহ ﷻ কবুল করে নিন। আমিন।

আবদুল্লাহ আল মাসঊদ
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

ধৈর্যের পরিচয়

সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—আটকে রাখা, আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.

"হে নবি! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে।"[১]

অর্থাৎ হে নবি! আপনি তাদের সাথে নিজেকে আটকে রাখুন। তাদের থেকে আলাদা বা পৃথক হবেন না। বনি ইসরাইল বলেছিলো, যেমনটা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ.

"আমরা একই খাদ্যর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।"[২]

---

[১] সুরা কাহাফ: ২৮।

অর্থাৎ আমরা একই খাদ্যের উপর নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে পারবো না। যেমন আরবরা বলে থাকে-

"অমুককে সবর করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে" তথা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সবর শব্দটি অধৈর্য বা ঘাবড়ে যাওয়ার বিপরীত।[৩]

ধৈর্যের সংজ্ঞা

নিজেকে নফসের পক্ষপাতী করা থেকে বিরত রাখা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকা। এভাবেও বলা যায় যে, প্রিয়তম প্রভুর চাহিদানুযায়ী নিজের মন বা হৃদয়কে আটকে রাখা ও আল্লাহ ﷻ-র নিষেধাজ্ঞাগুলোকে মেনে তার উপর নিজেকে বন্দি রাখা। আর যে ব্যক্তি কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে তাকে 'সাবের' বা ধৈর্যধারণকারী বলা হয়। কেননা সে নিজেকে হতাশা ও পেরেশানি থেকে দূরে রেখেছে। তাই তো রমজান মাসকে 'ধৈর্যের মাস' বলা হয়। কেননা মুসলিমরা রমজান মাসে নিজেদেরকে খাবার-দাবার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রাখে।[৪]

ধৈর্যের স্তর

ধৈর্য কেবল এক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অনেক স্তর রয়েছে যা একটা অন্যটা থেকে উত্তম। আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের উপর নিজেকে অটল রাখতে ধৈর্যধারণ করা, গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ধৈর্যের তুলনায় বেশি মর্যাদাবান। কারণ আল্লাহ ﷻ-র ওয়াজিব বিধান পালন করা তার কাছে গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেয়েও উত্তম। আর গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার ধৈর্যটা বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ অপেক্ষা উঁচু স্তরের। কেননা ওয়াজিব বিধান পালন করা ও গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা হলো মানুষের ইচ্ছাধীন। আর কারো পক্ষ থেকে কোনো কিছুর উপর বাধ্য করার কারণে তাতে ধৈর্যধারণ করা—এটা ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য

---

[২] সূরা বাকারা : ৬১।
[৩] লিসানুল আরব : ৪/৪৩৭।
[৪] তাফসিরে তাবারি : ১/২৯৮।

করার জন্য ধৈর্যধারণ এবং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা কোনো বালা-মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করা থেকে উঁচু স্তরের।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন, আমি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

জুলেখার প্রেমের প্রস্তাবের মোকাবিলায় ইউসুফ ﷺ-এর ধৈর্যধারণ করা, তার ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, পরবর্তীতে মিশরের বাজারে বিক্রি হয়ে যাওয়া ও মা-বাবার থেকে পৃথক হওয়ার দুর্দশার উপর ধৈর্যধারণ করার তুলনায় উত্তম।

কেননা ইউসুফ ﷺ-এর সাথে তার ভাইদের যে আচরণ ছিলো তাতে ধৈর্যধারণ ছিলো অনিচ্ছাধীন। সেখানে ধৈর্য ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিলো না। কিন্তু জুলেখার মিথ্যা প্রেমে হাবুডুবু না খেয়ে নিজেকে সংযত রাখা ছিল ইচ্ছাধীন ও মনের সাথে যুদ্ধের নামান্তর।

কেননা ইউসুফ ﷺ তখন যুবক ছিলেন, আর জুলেখাও ছিলো সুন্দরী, রূপবতী। জুলেখা যখন ইউসুফ ﷺ-কে তার ভরা যৌবনে হাবুডুবু খেতে ডেকেছিলো; তখন সেখানে কেউ ছিলো না। দরজা-জানালা সবগুলো ছিলো বন্ধ, তখন ইউসুফ ﷺ-এর যৌবন আরো দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কথা। আর এখানে কোনো লজ্জারও বিষয় ছিলো না। কারণ লজ্জা হয় সেসব ক্ষেত্রে—যেখানে পরস্পর অপরিচিত হয়ে থাকে; কিন্তু তারা উভয়ে পূর্ব-পরিচিত ছিলো। দুজন দুজনকে অনেক আগে থেকেই চিনতেন। আবার আশে-পাশে কোনো দারোয়ানও ছিলো না। শুধু তাই নয়; জুলেখা ইউসুফ ﷺ-কে যিনার আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকি-ধমকিও দিয়েছিলো।

ইউসুফ ﷺ একমাত্র আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে নিজের যৌবনের লাগামকে টেনে ধরেছেন। আবেগের বশে তিনি মিথ্যা প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাননি। এত বড় বিষয়ের উপর তার ধৈর্যধারণ করা কেবল ইচ্ছার কারণেই সম্ভব হয়েছিলো।

সারকথা হলো—ধৈর্যের সর্বোচ্চ ও পূর্ণ স্তর হলো আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের উপর নিজেকে আটকে রাখা। আর গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা হলো তার পরের স্তর।[৫]

ধৈর্যের হুকুম

মুমিন প্রিয় বান্দাকে প্রেমময় আল্লাহ ﷻ ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ইমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৬]

আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেন—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

"ধৈর্যের সাথে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।"[৭]

মুমিনকে আল্লাহ ﷻ অধৈর্য হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ.

"আপনি সবর করুন—যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন, আপনি তাদের বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না।"[৮]

---

[৫] মাদারিজুস সালেকিন : ২/১৫৭।
[৬] সূরা আলে ইমরান : ২০০।
[৭] সূরা বাকারা : ৪৫।
[৮] সূরা আহকাফ : ৩৫।

জিহাদের ময়দানে কাফিরদের সামনাসামনি হওয়ার সময়েও ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহ ﷻ আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ.

"হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সামনাসামনি হবে বিশাল বাহিনি নিয়ে, তখন তোমরা পিছ-পা হবে না।"[৯]

আল্লাহ ﷻ দুর্ভাবনা ও চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

"তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো না, ব্যথিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"[১০]

শরয়ীভাবে ধৈর্য কয়েক প্রকার হতে পারে: এক. ওয়াজিব, দুই. মুস্তাহাব, তিন. মাকরূহ, চার. হারাম, পাঁচ. মুবাহ। আবার কখনো-কখনো সব কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা মুমিনের জন্য আবশ্যকীয় নয়।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ.

"আর যদি তোমরা জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো তাহলে যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দিয়েছে সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ

---

[৯] সূরা আনফাল : ১৫

[১০] সূরা আল ইমরান : ১৩৯।

করো। তবে যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে সবরকারীদের জন্য তা উত্তম।”[১১]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মাজলুমের জন্য জালেম থেকে জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি আছে। তবে জালেম থেকে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তাতে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া ভাল ও উত্তম কাজ। এ থেকে বুঝা যায়—ধৈর্য কখনো মুস্তাহাব হয়ে থাকে, যদি তা না হতো তাহলে এখানে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়তো।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন-

১. ওয়াজিব বিধানের উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণ হয় এমন কাজের উপর ধৈর্যধারণ করা হারাম।

২. হারাম থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব, আর হারামের উপর ধৈর্যধারণ হারাম।

৩. মুস্তাহাবের উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব, আর মুস্তাহাব ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। এমনিভাবে মাকরুহ থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব।

৪. মাকরুহের উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ।

৫. মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ।[১২]

ওয়াজিব কাজ ও গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে আপতিত কোনো মুসিবতের উপর অধৈর্য ও বিরক্তি প্রকাশ না করাও ওয়াজিব।

---

[১১] সূরা নাহল : ১২৬।

[১২] উদ্দাতুস সাবেরিন : ২৩।

ওয়াজিব ধৈর্যের উদাহরণ

ফজরের সালাতে যেতে যে কষ্ট হয়ে থাকে, তার উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। যিনা থেকে নিজেকে বিরত ও সংযত রাখাও ওয়াজিব। কোনো মুসিবতে পতিত হলে চিৎকার-চেঁচামেচি কামড়া-কামড়ি ইত্যাদি না করাও ওয়াজিব।

মুস্তাহাব ধৈর্যের উদাহরণ

রাতের সালাত আদায় করতে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে পানি পান করা হলো মাকরুহ। সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান না করে বসে পান করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাতে ধৈর্যধারণ করাও মুস্তাহাব।

মাকরুহ ধৈর্যের উদাহরণ

মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। আর মাকরুহ কাজ থেকে বিরত না থেকে সেগুলোকে অনবরত করে যাওয়াও মাকরুহ।

হারাম ধৈর্যের উদাহরণ

কারো স্ত্রী খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে আর স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বাঁধা দিতে সক্ষম, তখন তাকে বাঁধা প্রদান না করে ধৈর্যধারণ করা হলো হারাম।

মুবাহ ধৈর্যের উদাহরণ

মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ।

ধৈর্যের প্রকার

অবস্থান হিসেবে ধৈর্য দুই প্রকার:

১. শারিরিক ধৈর্য।
২. আত্মিক ধৈর্য।

এই প্রকার আবার দুই ধরণের: ক. ইচ্ছাধীন, খ. অনিচ্ছাধীন। সেই হিসেবে ধৈর্যের মোট চারটি প্রকার হতে পারে- ১. শারিরিক ইচ্ছাধীন ধৈর্য, যেমন: ইচ্ছা করে কোনো গুনাহের কাজ না করা। ২. শারিরিক অনিচ্ছাধীন ধৈর্য, যেমন: বিনা কারণে কেউ কাউকে শরীরে আঘাত দিলো; আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাতে ধৈর্যধারণ করলো। এখানে তার ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই। ৩. ইচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য, যেমন: কেউ মনের খোরাকের জন্য গান-বাদ্য শুনা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে। ৪. অনিচ্ছাধীন আত্মিক ধৈর্য, যেমন: কেউ তার প্রিয়াকে হারিয়ে ধৈর্যধারণ করছে। জগতের সব মানুষই এই প্রকার ধৈর্যের মাঝে ঘূর্ণায়মান। তবে ইচ্ছাধীন দুই প্রকারের মাধ্যমে মানবজাতি অনান্য প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

ধৈর্যের সময়

আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একবার রাসুল ﷺ এক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন একজন মহিলা কবরের উপর অঝোরে কাঁদছে। তখন রাসুল ﷺ বললেন-

'হে মহিলা! আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করো এবং তোমার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করো। উত্তরে সে মহিলা বললো, আপনি তো আর আমার মতো না (আমার মতো হলে বুঝতেন কষ্ট কাকে বলে!); তখন দয়ার নবি মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন না। কিন্তু ঐ মহিলা নবিকে চিনতেন না, তাই সে এভাবে বলেছে। ক্ষণিকপরে মহিলাকে জনৈক ব্যক্তি বলল—(আরে!) এই ব্যক্তি তো নবি মুহাম্মাদে আরাবি ﷺ। অতঃপর মহিলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর দরজা মুবারকের সামনে গেলেন, কিন্তু রাসুল ﷺ-কে সেখানে পেলেন না। মহিলা বলতে লাগলো—'আমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি; আমি তো নবিকে চিনতাম না।' তখন রাসুল ﷺ জবাবে বললেন—'হে মহিলা, শোনো! কোনো বিপদের ধৈর্যতো প্রথম কষ্টের সময়েই হয়ে থাকে। (প্রথম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করা হচ্ছে ধৈর্যধারণের আসল সময়।)[১৩]

---

[১৩] সহিহ বুখারি : ১২৮৩।

আল্লামা কুরতুবি ﷺ বলেন-

বুকে হাজারো কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অনেক সওয়াব দান করেন। প্রথম যখন কোনো বিষয় মাথার উপর চেপে বসে ঠিক তখনই ধৈর্যধারণ করা হলো আসল সময়। এরপরে তো এমনিতেই ধীরে-ধীরে কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। তারপরে আর ধৈর্য ধরতে হয় না। এমনিতেই ধৈর্যধারণ করতে হয়। কারণ ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তাই বলা হয়—সত্যিকার জ্ঞানী প্রথম কষ্টেই ধৈর্য ধরতে পারে, আর মূর্খরা তা তিন দিন পরে করতে সক্ষম হয়।[১৪]

ধৈর্যের বাস্তবতা

মহান রবের আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা হলো সর্বোচ্চ ধৈর্যধারণ। এই প্রকারের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ ﷻ কুরআনে অসংখ্যবার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ.

“আপনি তার ইবাদত করুন ও তাতে সবর করুন, তথা সুদৃঢ় থাকুন।”[১৫]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ ﷻ ‘ওয়াসতাবির’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেটা ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তরকে বুঝায়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ﷻ-র বিধান আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

“আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাত কায়েম করতে আদেশ করুন এবং তাতে ধৈর্যধারণ করতে বলুন।”[১৬]

---

[১৪] তাফসিরে কুরতুবি : ২/১৭৪।
[১৫] সূরা মারইয়াম : ৬৫।
[১৬] সূরা ত্বোহা : ১৩২।

আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতের আনুগত্যের তিনটি ধরণ হয়ে থাকে।

এক. আনুগত্যের পূর্বের ধৈর্য; সেটা হচ্ছে—আনুগত্যের জন্য নিয়তকে সহিহ ও স্বচ্ছ এবং লৌকিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

দুই. আনুগত্যের মাঝের ধৈর্য—সেটা হচ্ছে ইবাদত করার জন্য অনবরত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা।

তিন. আনুগত্যের পরের ধৈর্য—সেটা হচ্ছে ইবাদত করার পর তা কারো কাছে প্রকাশ না করা ও খোঁটা ইত্যাদির মাধ্যমে আমলকে বিনষ্ট না করার উপর ধৈর্যধারণ করা। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের আমলকে বিনষ্ট করে দিও না।"[১৭]

গুনাহ না করার ধৈর্য

সহিহ নিয়তের মাধ্যমে গুনাহ ও পাপকে ছেড়ে দেওয়া, গুনাহ না করার উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং গুনাহ ছাড়তে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব।

দুঃখের উপর ধৈর্য

মুজাহিদ ﵀ বলেন-

'সবরে জামিল' হলো, কষ্ট ও দুঃখ পাওয়ার পরেও অস্থিরতাকে ও দুঃখটাকে বুকে চেপে রাখা এবং ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা।'[১৮]

---

[১৭] সুরা বাকারা : ২৬৪

[১৮] তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৬১৯।

যেমন কোনো কষ্টে নিপতিত হলে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা, মাথায় থাপ্পড়, গালে থাপ্পড় মারা, এমনিভাবে জাহেলি যুগের মানুষদের ন্যায় যুগের কোনো বদদোয়া ইত্যাদি না করা।

তবে হ্যাঁ, মুসিবতে পতিত হয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারের নিকট শরণাপন্ন হওয়া ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ নয়। এমনিভাবে মুসিবতে ও কষ্টে আক্রান্ত হয়ে নিরবে ক্রন্দন করাও ধৈর্যের বিপরীত নয়।

সুফিয়ান সাওরি ﵀ বলেন-

তিন জিনিষের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করবে—

১. দুঃখ-কষ্ট কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।
২. বালা-মুসিবতের কথা কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে।
৩. হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার কথা সবার কাছে না বলে ধৈর্যধারণ করবে।

তবে সুফিয়ান সাওরি ﵀-এর বক্তব্যের অর্থ হলো নারাজ বা বিরক্ত হয়ে কাউকে বলবে না। নতুবা চিকিৎসা বা অন্যান্য কারণে অন্যকে বলা ধৈর্যের বিপরীত কাজ নয়। তবে অনেকে বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার দাবি করলেও বলার ধরণ থেকে বুঝা যায় সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। যেন মুখে একটা আর অন্তরে আরেকটা। এমন না করা চাই।

ধৈর্যের ফসল

ধৈর্য হলো সফলতা বা সওয়াব পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। ধৈর্যের ফলাফল অগণিত। ধৈর্যধারণের উপকারও অনেক। বলা যায়—মুমিনের জন্য দুনিয়ার সব ভালো কেবল ধৈর্যধারণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

কবি দরদমাখা কণ্ঠে আবৃত্তি করেন-

দুঃখ-কষ্ট সহজ মনে করবে; হবে না অধৈর্য,
কামনা-বাসনা হবেই পূরণ; করলেই হায় ধৈর্য।[১১]

---

১১ রুহুল মাআনি : ৪/১৭৬।

প্রিয় বন্ধু! একটু ভেবে দেখুন—হযরত ইউসুফ ﷺ বিপদে পড়ে কিভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন। আর তার এ ধৈর্যধারণের ফলেই তিনি বাদশাহর নিকটভাজন হতে পেরেছিলেন।

কবি অনেক সুন্দর করে আবৃত্তি করেছেন-

প্রিয় নবি ইউসুফের ধৈর্যধারণে নেই কি তোমার নমুনা?
অপবাদ সয়েছেন, জেলেও থেকেছেন—নেই যার তুলনা।
অন্যায় না করেও জেলে খেটেছেন ধৈর্যশীল হয়ে,
সেই ধৈর্যই দান করেছে তাকে দুনিয়ার বাদশাহ লয়ে।[২০]

ইমাম গাযালি ﷺ বলেন-

আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের হাজারো গুণে গুণান্বিত করেছেন, কুরআনুল কারিমে সত্তর স্থানের চেয়েও বেশী স্থানে নিপতিত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেছেন ও ধৈর্যের প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের জন্য সফলতা নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ইমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[২১]

উপরোক্ত আয়াতে সফলতার টিকিট হিসাবে ধৈর্যকে সম্পৃক্ত করেছেন। যদি কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারে তাহলে সব ধরনের সফলতা তাকে ধরা দিবে।

---

[২০] তারিখে বাগদাদ : ১৩/৪৭৯।

[২১] সূরা আল ইমরান : ২০০।

বড় সওয়াবও মাফ পাবে

নেক আমল ও ধৈর্যশীল হলে তার জন্য ক্ষমা ও আল্লাহ ﷻ-র কাছে ধৈর্যের বিনিময়ে অনেক সওয়াব পাবে। ধৈর্যশীলরা কখনোই অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবেন না। তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

"কসম যুগের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়—যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে আদেশ করে সত্যের ও ধৈর্যধারণের।"[২২]

যারা আল্লাহ ﷻ-র দেওয়া হাজারো কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে, অধৈর্য হয় না। কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খেয়েও আল্লাহ ﷻ-কে ভুলে যায় না বরং সবসময় নেক আমল করে, তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে বিশাল উপহার রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.

"যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।"[২৩]

ধৈর্য-ই জান্নাতের সুগম পথ

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় যদি কোনো ব্যক্তির বন্ধুর প্রাণপাখি উড়ে যায় না ফেরার দেশে, আর সে তার বন্ধুর বিরহে ধৈর্যধারণ করে ও সওয়াবের কামনা করে তাহলে আল্লাহ ﷻ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রাখেন।

প্রিয় সাহাবি আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

---

[২২] সুরা আছর : ১-৩।

[২৩] সুরা হুদ : ১১।

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، إلا الجنة.

"আমি যখন আমার কোনো বন্ধুকে দুনিয়ার জমিন থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি, তার বিরহ-বেদনার উপর (যদি কোনো বান্দা) ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশায়; তাহলে প্রতিদান হিসেবে সে আমার সেই মুমিন বান্দাকে জান্নাত দেওয়া হয়।"[২৪]

নবি ﷺ এক মহিলাকে দুঃখের ওপর ধৈর্যধারণের কারণে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন।

আতা ইবনু আবি রাবাহ ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস ﷺ একবার আমাকে বলেন—'হে আতা! আমি তোমাকে জান্নাতি নারি দেখাবো না?' আমি বললাম—'জ্বী, হ্যাঁ।' তখন তিনি বলতে লাগলেন—এই কালো মহিলা একদা নবি করিম ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন—"হে আল্লাহর রাসুল! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত; কখনো এই রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়। দয়া করে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে আমার এ রোগ ভাল হয়ে যায়।" উত্তরে নবি ﷺ বলেন-

'তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করে এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করতে পার। আর যদি তোমার সুস্থতার জন্য দোয়া করতে বলো, তাও পারবো।' তখন উত্তরে মহিলা বললো—হে রাসুল! আমি ধৈর্যধারণ করবো। কিন্তু সাথে এ আবেদন করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি আমার জন্য দো'আ করবেন যেন সতর খুলে না যায়। তখন রাসুল ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন।[২৫]

আল্লাহ ﷻ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তোমার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হবে, সুতরাং তাতে তোমার ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলেই তুমি পাবে জান্নাতের সুখ, পাবে আখেরাতের হাজারো নিয়ামত। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

---

[২৪] সহিহ বুখারি : ৬৪২৪।

[২৫] সহিহ বুখারি : ৫৬৫২, সহিহ মুসলিম: ২৮২৩।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

"তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমাদের উপর (সেসব দুর্দশা) আপতিত হবে না, যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর আপতিত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে—কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"[২৬]

আলি ইবনু হুসাইন ﵁ বলেন, কিয়ামতের দিন ধৈর্যশীলদেরকে (হাশরের ময়দানে) দাঁড়ানোর জন্য ডাকা হবে, অতঃপর কিছু লোকদেরকে বলা হবে—"তোমরা সমবেত হও"। তারপর তাদেরকে বলা হবে—হে অমুকেরা! তোমরা জান্নাতের সুখময় উদ্যানের দিকে চলে যাও, চলার পথে ফেরেশতাকুলের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলবে আমরা 'আহলে সবর' বা ধৈর্যশীল বান্দা। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কিসের উপর ধৈর্যধারণ করেছো? তারা বলবে, আমরা আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করেছি, গুনাহ না করার উপর ধৈর্যধারণ করেছি। তখন ফেরেস্তারা বলবে, যাও! জান্নাতে প্রবেশ করো। কতই উত্তম প্রতিদান তোমাদের জন্য। (সুবহানাল্লাহ)[২৭]

আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন-

حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات.

---

[২৬] সুরা বাকারা: ২১৪।
[২৭] হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৩৯-১৪০।

"কষ্টের মাধ্যমেই জান্নাতকে বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। কামনা-বাসনার মাধ্যমেই জাহান্নামকে বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে।"[২৮]

প্রিয় বন্ধু! একটু ভেবে দেখুন—কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ ছাড়া আপনি কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন? প্রবৃত্তি থেকে ধৈর্যধারণ ব্যতীত আপনি কিভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবেন?

উপরোক্ত হাদিস তো এ কথার দলিল যে—জান্নাতে যেতে হলে তোমাকে হাজারো কষ্ট সহ্য করতে হবে ও তাতে সবর করতে হবে। 'কষ্টের মাধ্যমে ঘিরে রাখা হয়েছে' মানেই তো হলো জান্নাতের ঐ সুখ-শান্তি পেতে হলে বুকে ধারণ করতে হবে পৃথিবির হাজারো মুসিবত। সহ্য করতে হবে হাজারো দুঃখ-বেদনা। 'জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে প্রবৃত্তির মাধ্যমে' মানেই হলো গুনাহ থেকে বিরত থাকার উপর ধৈর্যধারণ করা ছাড়া কেউ নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

জান্নাতে ধৈর্যশীলদের জন্য ফেরেশতাদের সালাম উপহার

ধৈর্যশীলদেরকে জান্নাতে ফেরেশতারা সালাম দিবে। সারিবদ্ধ হয়ে ধৈর্যশীলদের অভিবাদন জানাবে। সালামকারীদের থেকে কেবল সৌন্দর্যই ঠিকরে পড়বে। চারদিকে শুধু মেশকের মৌ মৌ সুঘ্রাণ। মিষ্টি হেসে তারা ধৈর্যশীলদের সালাম নিবেদন করবে। মহান রব পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

"ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমার এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।"[২৯]

---

[২৮] সহিহ মুসলিম : ২৮২৩।

[২৯] সুরা রাদ : ২৪।

ধৈর্যশীলদের জন্য প্রশংসার বাড়ি

যখন কোনো ব্যক্তির সন্তান হারিয়ে সে বিরহ-বেদনা সহ্য করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ ﷻ প্রতিদান হিসেবে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন, যার নাম হলো "বায়তুল হামদ" বা প্রশংসার বাড়ি। প্রিয়জনকে হারিয়ে যদি আমরা অশুভ কোনো আচরণ না করে ধৈর্যধারণ করি, তাহলে আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশে জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যানে আমাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

আবু মুসা আশআরি ﷺ বলেন, রাসুল ﷺ বলেন-

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد.

"যখন কারো সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ ﷻ ফেরেশতাদেরকে বলেন—তোমরা আমার এক বান্দার সন্তানকে নিয়ে এসেছো? তখন তারা উত্তরে বলে—'জ্বী।' আল্লাহ ﷻ আবার জিজ্ঞেস করেন—'তোমরা কি তার অন্তরের প্রশান্তি নিয়ে এসেছো?' ফেরেশতারাও উত্তরে বলে—'জ্বী।' তখন আল্লাহ ﷻ জিজ্ঞেস করেন—'আমার বান্দা কি বললো?' তারা বলে—'সে বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে এবং (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন) দুআ পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ ﷻ বলেন—'যাও, তোমরা আমার সে বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো এবং সেই বাড়ির নাম রেখে দাও 'বায়তুল হামদ'।"[৩০]

ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট হবে না

দয়াময় আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের আমলকে বিনষ্ট করবেন না, বরং আরো দ্বিগুণ করে দিবেন। মহান আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

[৩০] সুনানু তিরমিযি : ১০২১।

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

"নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে আল্লাহ ﷻ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দিবেন না।"[৩১]

সওয়াব অর্জন

যদিও সব আমলের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ প্রতিদান আছে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের প্রতিদান হবে সীমাহীন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ.

"আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তারা বললো—ধিক্কার তোমাদের জন্য। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ-র দেয়া সওয়াব-ই উৎকৃষ্ট। এটা কেবল ধৈর্যধারণকারীরাই পায়।"[৩২]

ধৈর্যশীলদেরকে দিগুণ সওয়াব দান করা হবে

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا.

"তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে সবরের কারণে।"[৩৩]

ধৈর্যধারণকারীরা দয়াময় প্রভুর থেকে সওয়াব পাবে গণনাহীন। ধৈর্যধারণের সওয়াব অন্যান্য প্রতিদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কেননা অন্যান্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ ﷻ যা দান করেন, ধৈর্যধারণের বেলায় এর চেয়ে দিগুণ দান করেন। আল্লাহ ﷻ আরো ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.

---

[৩১] সূরা ইউসুফ : ৯০।
[৩২] সূরা কাসাস : ৮০।
[৩৩] সূরা কাসাস : ৫৪।

"ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দেওয়া হবে হিসাব ছাড়া।"[৩৪]

সুলাইমান ইবনু কাসেম ؒ বলেন-

প্রত্যেক সওয়াবের প্রতিদান সম্পর্কে জানা যায়, কিন্তু ধৈর্যটা এর ব্যতিক্রম। কেননা সবরের বেলায় আল্লাহ ﷻ প্রতিদান দেন সীমাহীন।[৩৫]

আওযাঈ ؒ বলেন, ধৈর্যশীলদের এত বেশী সওয়াব দান করা হয় যে, যা মাপা বা ওজন করাও সম্ভব না। ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ ﷻ সওয়াবের সাগরে ডুবিয়ে দেন।[৩৬]

দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জন

আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের দ্বীনের নেতা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.

"তারা ধৈর্যধারণ করতো বিধায় আমি তাদের মধ্যে থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম—যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করতো। তারা আমার আয়াত সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো।"[৩৭]

ইবনু তাইমিয়্যা ؒ বলেন, ধৈর্য ও ইয়াকিনের মাধ্যমে দ্বীনের সর্দার হওয়া যায়।[৩৮]

আল্লাহ ﷻ-র বন্ধুত্ব অর্জন

ধৈর্যশীলদের ফলাফল হলো—তারা আল্লাহ ﷻ-র সাথী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

---

[৩৪] সুরা যুমার :১০।
[৩৫] যাম্মুল হাওয়া : ৬০।
[৩৬] তাফসিরে ইবনু কাসির : ৪/৬৩।
[৩৭] সুরা সাজদাহ : ২৪।
[৩৮] মাজমুআতুল ফাতাওয়া : ৩/৩৫৮।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৩৯]

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

ধৈর্যশীলদের আল্লাহ ﷻ অসংখ্য সাহায্য করবেন, তাই তো আল্লাহ ﷻ ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তার থেকে সাহায্য কামনা করতে আদেশ করেছেন।

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

"তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর।"[৪০]

সুতরাং যে তার উপর নিপতিত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করবে না, তার জন্য প্রিয়তম প্রভুর থেকে সাহায্যও আসবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি যা অপছন্দ করো তাতে ধৈর্যধারণের বেলায় তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। আর জেনে রাখো, রবের সাহায্য কেবল ধৈর্যধারণকারীদের সাথেই।[৪১]

ইমানের পাখি সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যধারণ করার কারণে আল্লাহ ﷻ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.

"অবশ্য তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং বিরত থাকো আর কাফেররা যদি তোমাদের উপর চড়াও হয় তাহলে তোমাদের

---

[৩৯] সুরা বাকারা : ১৫৩।

[৪০] সুরা বাকারা : ৪৫।

[৪১] মুসনাদু আহমাদ : ২৮০০।

পালনকর্তা চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।"[৪২]

বনি ইসরাইলকে ফেরআউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন একমাত্র ধৈর্যের কারণে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ.

"আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমি এ ভূ-খন্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যেখানে আমার বরকত সন্নিহিত রয়েছে। আর বনি ইসরাইলের উপর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ। একমাত্র তাদের ধৈর্যধারণের কারণে। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সব কিছু—যা তৈরী করেছিলো ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করে দিয়েছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছে।"[৪৩]

ইমাম শাফেঈ ﷺ বলেন, ধৈর্য হলো স্থিরতা আর এর ফলাফল হলো বিজয়।[৪৪]

শত্রুতার ছলনা থেকে মুক্তি

ধৈর্যধারণ ও তাকওয়া বা খোদাভীরুতা হলো শত্রুর প্রতারণা থেকে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদেরকে শত্রুর ছলনা ও প্রতারণা থেকে মুক্তি দিবেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا.

---

[৪২] সুরা আলে ইমরান : ১২৫।
[৪৩] সুরা আল আ'রাফ : ১৩৭।
[৪৪] তারিখে দিমাশক : ৫১/৪০৮।

"তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।"[৪৫]

আল্লাহ ﷻ-র রহমত ও পুরস্কার অর্জন

ধৈর্যশীলদের আল্লাহ ﷻ রহমত, অনুগ্রহ ও উত্তম পুরস্কার দান করবেন, যা তিনি অন্য কাউকে একসাথে দান করেননি। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

"ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। যখন তারা কোনো বিপদে পতিত হয় তখন সে বলে, আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই কাছে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। এরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।"[৪৬]

প্রভুর প্রেম অর্জন

যারা বিপদে-আপদে আল্লাহ ﷻ-র উপর ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ ﷻ তাদের অনেক ভালোবাসেন। মুসিবতে অধৈর্য হবেন না। তাহলে প্রভুর ভালোবাসার মানুষ হতে পারবেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.

"আর অনেক নবি ছিলেন যাদের সাথী-সঙ্গীরা তাদের অনুগত হয়ে জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে। তাদের কিছু নষ্ট হয়েছে বটে তবুও তারা আল্লাহর রাহে হেরে যাননি, ক্লান্তও হননি এবং দমেও

---

[৪৫] সুরা আলে ইমরান : ১২০।

[৪৬] সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭।

যাননি। আর যারা ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদেরকে খুব ভালোবাসেন।"[৪৭]

আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা অর্জন

যারা মুসিবতে পতিত হয়ে হাজারো কষ্টকে বুকে ধারণ করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ ﷻ তাদের প্রশংসা করবেন। আল্লাহ ﷻ তার প্রিয় বান্দা আইয়ুব ﷺ-এর উত্তম প্রশংসা করেছেন, কেননা সে কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

"আমি তাকে পেলাম ধৈর্যধারণকারী। চমৎকার বান্দা সে; নিশ্চয়ই সে ছিলো প্রত্যাবর্তনশীল।"[৪৮]

আলোর পথ অর্জন

মালেক আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেন-

والصلاة نور، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك.

"সালাত হলো তোমাদের জন্য নূর, ধৈর্য তোমাদের জন্য আলোর পথ। আর কুরআন তোমার জন্য হুজ্জাত বা দলিল।"[৪৯]

ধৈর্যধারণ করুন

নিম্মোক্ত আয়াতগুলোর বাস্তবতা ও উপকারিতা কেবল ধৈর্যশীলরাই অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

---

[৪৭] সুরা আলে ইমরান : ১৪৬।

[৪৮] সুরা সোয়াদ : ৪৪।

[৪৯] সহিহ মুসলিম : ২২৩।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

"আমি মুসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম—সে তার স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনসমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[৫০]

পবিত্র কুরআনুল কারিমে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

"তুমি কি দেখনা আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করান, নিশ্চয় প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৫১]

আল্লাহ ﷻ ধৈর্যশীলদেরকে বুঝানোর জন্য 'সাবা' এর ঘটনা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন-

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

"আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[৫২]

---

[৫০] সুরা ইবরাহিম : ৫।
[৫১] সুরা লোকমান : ৩১।
[৫২] সুরা সাবা : ১৯।

আল্লাহ ﷻ-র হাজারো অনুগ্রহে বান্দা নিমজ্জিত। যেমন আল্লাহ ﷻ মানবকে নদীতে কত সুন্দর করে নৌকার মাধ্যমে পার করেন, এসব নিয়ামত কেবল ধৈর্যশীলরাই বেশী বুঝবে। তাই আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.

"সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তার অন্যতম নিদর্শন। তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন, তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে—যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যধারণকারী কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[৫৩]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ কেবল ধৈর্যশীলরাই বুঝবে ও অনুধাবন করবে। তাই আল্লাহ ﷻ-র আয়াতের প্রতি খেয়াল রেখে জীবন চলার পথে হাজারো কষ্ট আসলে তাতে ধৈর্যধারণ করবেন।

কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করলে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ ও প্রয়োজন মিটে

কবি আবৃত্তি করেন–

হইয়ো না নিরাশ—হবে যে বিনাশ যদিও হয় দেরী,
পাবে তুমি তোমার ধৈর্যের ফসল—থাকবে না কোনো বেড়ী।
যদি তুমি উন্নত হতে চাও, তবে গলেতে পরো ধৈর্যের মালা,
হবেই তোমার সুগম পথ, থাকবে না কোনো বালা।
সে জন সফল হয়েছে, যে জন পরেছে গলেতে ধৈর্যের মালা,
তুমিও পরো—পাবে ফসল, হবে না জীবন জ্বালা।[৫৪]

উম্মে সালমা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন, কোনো মুসলিমের ওপর যদি বিপদ আসে, আর সে বলে—এতো আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে আর দুআ পাঠ করে এবং বলে—"হে আল্লাহ! আমাকে মুসিবত থেকে মুক্তি দান করে আমার জন্য উত্তম ফয়সালা করুন এবং ভালোর কোনো কিছু থাকলে তার

[৫৩] সূরা আস শুরা : ৩২-৩৩।
[৫৪] দিওয়ানুল হামাসা : ২/৩৩।

ব্যবস্থা করুন।" তবে আল্লাহ ﷻ তাকে কল্যাণেরই খলিফা বানিয়ে দেন। উম্মে সালামা বলেন, যখন আবু সালামা মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমি বললাম, আবু সালামার মতো আর কে এত ভালো হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ ﷻ আমাকে ধৈর্যধারণের কারণে রাসুল ﷺ-কে তার পরিবর্তে (স্বামী হিসেবে) দান করেন।[৫৫]

ধৈর্যধারণ জগতে সম্মান হওয়ার পথ

ধৈর্যই মানুষকে এই জগত সংসারে সম্মানী বানিয়ে দেয়, ধৈর্যশীল কখনো কারো সামনে নিজের মাথা নত করে না। ধৈর্যের ফলে সে অন্য কারো জিনিষের প্রতি লোভী হয় না বরং নিজের যা থাকে তার উপরই তুষ্ট হয় এবং ধৈর্যধারণ করে।

ইয়ারমুক যুদ্ধে আবুল আওয়ার ؓ মুসলমানদের ডেকে বললেন—হে কুরাইশ গোত্র! তোমরা তোমাদের প্রতিদান ও ধৈর্যের অংশকে গ্রহণ করো। কেননা ধৈর্যই হলো দুনিয়ায় বড় সম্মান ও আখেরাতে রহমত ও ফজিলত। তাই ধৈর্যধারণ করো, অধৈর্য হয়ো না। সালিম কত সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন-

গলেতে আমি পরেছি সবরে জামিলের মালা,
প্রভু আমাকে রেখেছেন হেফাজত সব বখিলদের বালা।

ধৈর্যের ক্ষেত্র

ধৈর্যধারণ সাধারণভাবে তিনটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

১. আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্য।
২. গুনাহ ও পাপাচার থেকে বাঁচার উপর ধৈর্য।
৩. আল্লাহ ﷻ-র ফয়সালার উপর ধৈর্য।

[৫৫] সহিহ মুসলিম : ৯১৮।

উপরোক্ত তিন প্রকার হলো ধৈর্যের মূল ক্ষেত্র; কিন্তু এ ছাড়া ধৈর্যের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। এখানে ধৈর্যের মূল কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হবে, যেগুলোর সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা বেশী।

জগতের মুসিবতের উপর ধৈর্য

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া কেউ কখনো সফলতার উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আসলে দুঃখের পরেই সুখ আসে। তবে তার এ দুঃখ ও কষ্টটা সারাজীবন তার গলাতেই ঝুলে থাকবে, এমনটা নয়; বরং কিছুদিন মালিকের পক্ষ থেকে তার বান্দার উপর পরীক্ষামূলক থাকবে এবং বান্দা পরীক্ষায় পাশ করলেই আল্লাহ ﷻ আবার উঠিয়ে নিবেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।"[৫৬]

অর্থাৎ মানবকে কষ্ট, বালা-মুসিবতের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি। এই জগত সংসারে তার গলায় পরতে হবে হাজারো কষ্টের মালা।

জীবনে দুঃখ আসবে। তাই সেই দুঃখের মাঝে ঘাবড়ানো যাবে না। ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ ﷻ-র প্রতি আস্থা রাখতে হবে এই বলে যে—এগুলো হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ ﷻ মুমিনদেরকে বিভিন্ন দুঃখ ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয়, ক্ষুধা ও জান এবং মালকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদের।"[৫৭]

[৫৬] সূরা বালাদ : ৪।
[৫৭] সূরা বাকারা : ১৫৫।

প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ

আল্লাহ ﷻ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ.

> "হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"[৫৮]

আব্দুর রহমান ইবনু আওফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমরা নবি ﷺ-এর সাথে যে কোন বিপদে আক্রান্ত হলেই ধৈর্যধারণ করেছি। অতঃপর আমাদের সুখ-সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, কিন্তু আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারিনি (আমরা অনেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ফেলেছি)।[৫৯]

পৃথিবির কিছু মানুষ এমন আছে যাদেরকে জেল–হাজতে পাঠালে তারা তাতে ধৈর্যধারণ করে, কিন্তু এরপরে যখন ঐ ব্যক্তিকেই ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, সুখ-সমৃদ্ধে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়; তখন সে আর ধৈর্যধারণ করতে পারে না; সে অধৈর্য হয়ে ব্যর্থ হয়। জগতের সব মানবই ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে একই ধরণের। তাই তো কবি আবৃত্তি করেছেন–

বালা-মুসিবতে করতে পারে ধৈর্য
যদিও কাফের ও মুমিন হয়।
তবে সুখ-সমৃদ্ধিতে করে ধৈর্য
এতে সিদ্দিক-ই কেবল রয়।[৬০]

[৫৮] সুরা মুনাফিকুন :৯।

[৫৯] সুনানু তিরমিযি : ২৪৬৪।

[৬০] তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব : ১৮৫।

প্রবৃত্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে চাইলে কয়েকটি কাজ করতে হবে

১. মনোবাসনা ও প্রবৃত্তি পূরণের জন্য নিজেকে একদম ডুবিয়ে দিবে না।

২. হৃদয়ের চাহিদাকে খুঁজে পেতে যথার্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে না। পৃথিবির অনেক লোক আছে যারা নিজেদের চাহিদা মোতাবেক সম্পদ জোগাতে সভা, মিটিং ও বিভিন্ন কনফারেন্সে এতই ব্যস্ত থাকে যে, আল্লাহ ﷻ-র বিধানটুকু পালন করার সময় খুঁজে পায় না। আবার অনেক চাকুরিজীবি আছে যারা উন্নত চাকুরি করতে গিয়ে হাজারো কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে, তখন মালিকের কদমে দুটো সিজদা দিতেও সময় মিলে না। ধীরে-ধীরে তারা আমল থেকে দূরে থাকতে-থাকতে এক সময় একেবারেই আল্লাহবিমুখ হয়ে যায়। যেমন ব্রিটেনে ইংরেজি চাকুরিজীবিদের অবস্থা। তাদের নিয়ম হলো চাকুরিজীবিরা সপ্তাহে ছয়দিনই ব্যাংকে চাকুরি করবে এবং সপ্তাহে কেবল একদিন মন্দিরে বা মসজিদে ইবাদত করতে পারবে। (আমাদের দেশেও তেমনি সপ্তাহে কেবল শুক্রবার পুরো মসজিদ মুসল্লিদের মাধ্যমে টইটুম্বুর থাকে আর পরে এসব মুসল্লিদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে তার প্রতিটি বিধান সময় মতো পালন করার তাওফিক দান করুন।)

৩. আল্লাহ ﷻ-র হুকুকগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা; যেমন সদকা, ফিতরা প্রভৃতি।

৪. হারাম কাজে ব্যয় না করা। তাহলেই ইনশাআল্লাহ ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাবে।

ধৈর্যধারণের আরো ক্ষেত্র

আর সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের দিকে একেবারেই নিমজ্জিত না হওয়া। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.

“আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোকদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে সব উপকরণ

> দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"[৬১]

দুনিয়ার সম্পদ তোমাকে পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, আসলেই কি তুমি এগুলোকে নিয়ামত মনে করো কিনা? নাকি অধৈর্য হয়ে সম্পদের প্রাচুর্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মালিককে ভুলে যাও! আর পৃথিবিতে হাজারো কারুনের দল আছে, যারা অনেক সম্পদ অর্জন করেও তাতে ক্ষ্যান্ত থাকে না বরং আরো চাই, আরো চাই করে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

> "অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বলতে লাগলো, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো।"[৬২]

আর অনেক সাহাবায়ে কেরাম ﷺ আছেন, যারা অর্জিত সম্পদকে আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় ব্যয় করেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাদের কথা আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ.

> "তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। বরং তারা বোঝে না।"[৬৩]

---

[৬১] সুরা ত্বোহা : ১৩১।
[৬২] সুরা আল কাসাস : ৭৯।
[৬৩] সুরা আল মুমিনুন : ৫৫-৫৬।

রবের কাছে দুআর উপর ধৈর্যধারণ

আজকাল মানুষেরা দুআর উপর ধৈর্যধারণ করতে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। অথচ দুআর উপর ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বিশেষ ক্ষেত্র। তাই তো দ্বীন থেকে তারা ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আর এ দূরত্বটা তাকে অনেক বড় গুনাহ ও পাপ করতে বাঁধা দেয় না।

হযরত নূহ ﷺ প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তবুও সে মালিকের দরবারে শুধু দুআ করতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি অধৈর্য হয়ে দোয়া করাকে ছেড়ে দেননি। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا.

"সে বলল—হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করেছে।"[৬৪]

দু'আর ক্ষেত্রে কষ্ট কেবল দেহে নয় বরং মনেও ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ মনে কোনো আক্ষেপ করবে না। আর শত্রুর পক্ষ থেকে যত বদদোয়া আসুক না কেন তাতেও কোনো পরোয়া করবে না। তখনও মুমিন বান্দা ধৈর্য হারাবেন না। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

"অবশ্যই ধন-সম্পদ ও জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। আর তোমরা আহলে কিতাব কাফিরদের কাছ থেকে অনেক বড় অশোভন উক্তি শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা তোমাদের একান্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।"[৬৫]

---

[৬৪] সূরা নূহ : ৫-৬।
[৬৫] সূরা আলে ইমরান : ১৮৬।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.

"কাফেররা যা বলে সেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।"[৬৬]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا.

"আপনার পূর্ববতী অনেক নবিকে মিথ্যা বলা হয়েছে। আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা এতে ধৈর্যধারণ করেছেন।"[৬৭]

আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে শান্তি আসা পর্যন্ত দুআকে চালু রাখবেন, দুআকে বন্ধ করে দিবেন না এবং তার সাহায্য-সহযোগিতা আসার প্রহর গুণেই ধৈর্যধারণ করবেন। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

"তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমরা সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি—যারা পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও—আল্লাহর সাহায্যই নিকটবর্তী।"[৬৮]

---

[৬৬] সুরা মুযযাম্মিল : ১০।
[৬৭] সুরা আল আনআম : ৩৪।
[৬৮] সুরা বাকারা : ২১৪।

হৃদয়ে এ বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে যে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে সাহায্য আসবেই। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

"যখন পয়গম্বরগণ নিরাশ হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো; তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি উদ্ধার করেছি। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।"[৬৯]

যে মুমিন বান্দা সত্যের উপর থাকবে ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। তখন তার কষ্ট সহ্য করতে হবেই। আর এ কষ্ট-ক্লেশের ঔষধ একমাত্র ধৈর্যধারণ। অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাহায্য কামনা ও তার দরবারের দিকে ফিরে যাওয়া।

কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা

যখন বান্দার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হয়, তখন সে কষ্টকে মাথা পেতে নিবে। এতে সে অধৈর্য হবে না। শত্রুদের সামনে দাঁড়ালেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। প্রভুর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার জন্য ধৈর্যধারণ করা শর্ত। তবেই প্রভু থেকে সাহায্য আসবে। শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সময় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা অনেক বড় কবিরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا.

"তোমরা যখন কোনো শত্রুদের সাথে সাক্ষাত করো তখন স্থির থাকো।"[৭০]

---

[৬৯] সূরা ইউসুফ : ১১০।

[৭০] সূরা আল আনফাল : ৪৫।

অর্থাৎ শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে তখন পলায়ন করো না বরং ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ ﷻ এখনও দেখেননি কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।"[৭১]

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

"আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল ছাড়া আর বৈ কিছু না। তার পূর্বেও অনেক রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ ﷻ তাদের সওয়াব দান করবেন।"[৭২]

পূর্ববতী মুমিনরাও কষ্টের উপর স্থীর ছিলো, তালুতের সাথে অনেক মুমিন ছিলো যাদের হাজারো কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তালুতের সাথে ধৈর্যধারণ করেছেন। তারা কষ্টের কারণে কোথাও ভেগে যাওয়ার কল্পনাও করেননি। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ﷻ তাদের ইস্পাত লোহার মতো ধৈর্যধারণের কথা বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

---

[৭১] সূরা আলে ইমরান : ১৪২।

[৭২] সূরা আলে ইমরান : ১৪৪।

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

"অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হলো, তখন বললো—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে, সে আমার দলের অর্ন্তভুক্ত নয়। আর যে লোক স্বাদ গ্রহণ করবে না, নিশ্চয় সে আমার দলের লোক। কিন্তু যে লোক আঁজলা ভরে সামান্য পান করবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। তারপর তালুতের কথা অমান্য করে সবাই পানি পান করলো—সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন নদী পার হলো তখন তার সাথে ছিলো মাত্র কয়েকজন ঈমানদার। এরপরে ঐ সামান্য লোকেরা বলতে লাগলো, আজকের দিনে জালুত ও তার সেনাবাহিনিদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যাদের ধারণা ছিলো যে—আল্লাহর সামনে আমাদের একদিন দাঁড়াতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগলো, সামান্য দলই বিরাট দলের উপর আল্লাহর হুকুমেই জয়ী হয়েছেন। আর যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।"[৭৩]

তালুতের বাহিনির কিছু লোক অধৈর্য হয়ে অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই পানি পান করে ভেগে গিয়েছিলো, আর কিছু লোক ইস্পাত লোহার মতো শক্ত ও স্থির ছিলো এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাদের ধৈর্য ও ত্যাগের কারণেই আল্লাহ ﷻ তাদেরকে বিজয়ের মুকুট পরিধান করিয়েছেন।

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে

[৭৩] সূরা বাকারা : ২৪৯।

হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌঁছতে হবে কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবনে কখনোই পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে। খিজির ﷺ মুসা ﷺ-কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.

"তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?"[৭৪]

উত্তরে মুসা ﷺ বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.

"অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।"[৭৫]

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

ধৈর্য কি আল্লাহ প্রদত্ত?

অনেক মানুষ আছে যারা দুঃখ-কষ্ট, মুসিবতে পতিত হওয়ার পর তাদেরকে যদি ধৈর্যধারণের নসিহত করা হয়, তখন তারা বলে—আল্লাহ ﷻ তো আমাকে কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেননি, তাহলে আমি

---

[৭৪] সুরা কাহাফ : ৬৭-৬৮।

[৭৫] সুরা কাহাফ : ৬৯।

কিভাবে ধৈর্যধারণ করব? তারা মনে করে যে, ধৈর্য কেবল আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত! মানুষ তা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ঐসব বন্ধুদের কথাটা সঠিক মনে হয় না; যদি তাদের কথা সঠিক হতো তাহলে হাদিস ও নসের বক্তব্য বিপরীতমুখী হতো। কারণ অনেক শরয়ী দলিলের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ধৈর্য মানুষের সৃষ্টিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ চেষ্টা করলে তা অর্জন করতে সক্ষম।

আবু সাঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি বালা-মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করতে ইচ্ছে করে; আল্লাহ ﷻ তাকে ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেন।[৭৬]

তবে একথা বাস্তব যে, ধৈর্যধারণকারীদের বিভিন্ন স্তর আছে, সবাই একই রকম ধৈর্যধারণ করতে পারে না। আসল কথা হলো—ধৈর্য হচ্ছে হৃদয়ের একটি অবস্থা, যা অর্জন করে নিতে হবে। শুধু বললেই হয় না বরং অন্তরের সাথে অনেক মুজাহাদা করতে হয়। চেষ্টা করে এ ধৈর্যধারণ হাসিল করতে হয়। সাথে-সাথে যেসব কাজ ধৈর্যধারণ করতে সাহায্য করে সেগুলোকেও অবলম্বন করা। তাহলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে।

ধৈর্যের পথে চলুন...

এ সব কাজ করতে পারলে আপনি ধৈর্যের পথে হাঁটতে পারবেন ইনশা আল্লাহ! আল্লাহ ﷻ সবার জন্য সহায় হোন।

জগতের নিয়ম জানা

একথা হৃদয়ঙ্গম করে নিন যে, আল্লাহ ﷻ মানুষকে এ জগতে কষ্টের মাঝেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কষ্টের নদীতে ভাসতে ভাসতে একদিন সুখের দেখা পেয়ে আল্লাহ ﷻ-র সাথে সাক্ষাত করবে। একটু ভাবুন—দুনিয়াটা আসলেই কষ্টের জগত। এ জগত সংসারে যারাই দেখবেন বড় কিংবা মর্যাদাবান হয়েছে বা সফলতার পথ ধরে বিজয়মালা পরিধান করেছেন, তাদের পূর্বের পথচলা ছিলো অনেক কষ্টের। সুতরাং আপনাকেও এ জগত নামক কষ্টের

৭৬ সহিহ বুখারি : ১৪৬৯।

ভূবনে সফলতাকে খুঁজে পেতে হলে কষ্টের নদীতে ডুব দিতে হবে। ব্যস, এতটুকু ভাবলেই তো হয়। তাহলেই আপনার কাছে সে কষ্ট আর কষ্ট মনে হবে না। ধৈর্যধারণ করা আপনার জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে।

আবুল হাসান তাহামি ﵀ আবৃত্তি করেছেন-

হয়েছো সৃষ্টি কষ্টের মাঝে,
চলতে কেন চাও সহজের মাঝে।
মানুষ আদিষ্ট মনের বিপরীত,
পানি থেকে বের করে আনতে হবে আগুনের কুন্ডি।[৭৭]

জগতটাকে এমন ধারণা করলে আপনার জীবনে হাজারো দুঃখকে কখনোই দুঃখ মনে হবে না; আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন অনায়াসে। উপভোগ করতে পারবেন আপনার সোনালি জীবন। যে এমন বুঝতে পারবে তার কাছে জগতের যত গ্লানি আসবে সেটাকে একদম স্বাভাবিক মনে হবে। সয়ে যেতে পারবে সব ক্লান্তি। হৃদয়ে পাবে প্রশান্তি।

বালা-মুসিবত আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে

ধৈর্যধারণের আরেকটি মাধ্যম হলো—দুনিয়া কেবল আল্লার ﷻ-ই, তিনি যাকে চান দান করেন আর যাকে চান বঞ্চিত রাখেন এমন বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেওয়া। তাহলে আপনার আমার জন্য দুনিয়ার গ্লানির উপর ধৈর্যধারণ করা একদম সহজ হবে।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ.

"হে মানব! তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন আল্লাহর নিকটই কান্নাকাটি করো।"[৭৮]

---

[৭৭] দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিসের।

[৭৮] সুরা নাহল : ৫৩।

এ সমগ্র দুনিয়া ঐ মালিকেরই, (যিনি এ আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, তারকা, নিহারিকা, খাল-বিল, নদি-নালাসহ সব কিছুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা।) তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন আর যাকে ইচ্ছে বঞ্চিত করেন। তাই তো আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে যখন কোন বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতের মাধ্যমে কাউকে পরীক্ষা করা হয়; তখন সে যেন বলে—ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। এমনটাই আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

"যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে—নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।"[৭৯]

পৃথিবির সব মানুষ, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন আল্লাহ ﷻ-রই মালিকানায়। তিনি এগুলোকে মানবের কাছে 'ধার' হিসেবে দিয়েছেন, আবার যখন ইচ্ছা করলে এগুলো তিনি ফিরিয়ে নিবেন।

উম্মে সুলাইম ؓ-র প্রিয় সন্তানের প্রাণ পাখি না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার পর উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'হে আবু তালহা! তুমি কি মনে করো যদি কেউ বাড়ির মালিককে কোনো কিছু ধার হিসাবে দেয়, অতঃপর বাড়ির মালিকের থেকে সে ধারকৃত বস্তু আবার ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা কি তাদেরকে বাঁধা প্রদান করতে পারবে? বাড়ির মালিকের কোনো অন্যায় হবে?' আবু তালহা জবাব দিলেন, না। (অন্যায় হবে কেন? তার সম্পদ সে নিয়েছে।) তখন উম্মে সুলাইম ؓ বললেন, (তাহলে শোনো! আমাদের সন্তানের মালিক তো আল্লাহ ﷻ; তাই তিনি তার বস্তুকে নিয়ে নিয়েছেন। এতে কোনো আফসোসের কারণ নেই।) সুতরাং তোমার সন্তানের জন্য আল্লাহ ﷻ-র কাছে সওয়াব কামনা করো।[৮০]

[৭৯] সুরা বাকারা : ১৫৬।
[৮০] সহিহ মুসলিম : ২১৪৪।

সবরের মধ্যে সওয়াব নিহিত রয়েছে এমন ধারণা করা

সবরের পথে চলার আরো একটি মাধ্যম হলো—এটা মনে করবেন যে, আমার এ কষ্টের উপর আল্লাহ ﷻ সওয়াব দান করবেন ইনশা আল্লাহ!

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

"তাদের প্রতিদান কতইনা উত্তম! যারা বিভিন্ন কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং প্রেমময় প্রভুর উপর ভরসা করে।"[৮১]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, উপরোক্ত আয়াতে এটাই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যারা বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েও সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করবে আল্লাহ ﷻ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করবেন।[৮২]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন-

يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض.

"কিয়ামতের দিন (দুনিয়াতে) মুসিবতে পতিতদেরকে প্রতিদান দেওয়ার সময়কালে বিপদ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তরা বলবে—হায়! জগতে যদি আমাদের আরো কষ্ট দেওয়া হতো; এমনকি গায়ের চামড়াগুলোকে যদি কেঁচির মাধ্যমে কর্তন করা হতো; তবুও ভালো হতো, (আজ তাহলে আরো অনেক বড় প্রতিদান পেতাম।)"[৮৩]

ধৈর্যের নিয়ত করা

আব্দুল ওহেদ বিন যায়েদ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের ওপর সবরের নিয়ত করবে, আল্লাহ ﷻ তাকে সবর করার ক্ষমতা প্রদান

---

[৮১] সুরা আল আনকাবূত : ৫৮-৫৯।

[৮২] মাদারিজুস সালিকিন : ২/১৬৭।

[৮৩] সুনানু তিরমিযি : ২৪০২।

করবেন ও অনেক শক্তি প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিমুখতায় সবরের নিয়ত করবে আল্লাহ ﷻ তাকে সাহায্য করবেন ও পাপ থেকে পবিত্র রাখবেন।[৮৪]

কষ্ট লাঘবের বিশ্বাস করা

আল্লাহ ﷻ প্রত্যেক কষ্টের সাথে স্বস্তি ও রহমত রাখেন। কাউকেই হরহামেশা কষ্টের সাগরে ডুবিয়ে রাখেন না। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[৮৫]

আর আল্লাহ ﷻ কষ্টের পরে স্বস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, তিনি কখনো তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.

"অতএব আপনি সবর করুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।"[৮৬]

রাতের আঁধার কেটে ফজর আসবেই। সবসময় পৃথিবি রাতের কালো চাদরে ঢাকা থাকে না। একদিনতো ভোর হয়। (অবশ্যই কষ্টের পাহাড় থেকে একদিন স্বস্তির পাহাড় আসবেই। দুঃখের কালো মেঘ একদিন সরে যাবে। শুধু শর্ত হলো ধৈর্যধারণ করতে হবে। ধৈর্য হারানো যাবে না।)

কবি আবৃত্তি করেছেন-

আমার কষ্ট আরো বেড়ে গেছে,
আর তোমার সূর্য প্রভাত হওয়ার প্রান্তে।

---

৮৪ হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/১৬৩।
৮৫ সুরা আলাম নাশরাহ : ৫-৬।
৮৬ সুরা রুম : ৬০।

ইয়াকুব ﷺ তার প্রিয় পুত্র ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে হারিয়ে ধৈর্যধারণ করেছেন. পরবর্তীতে আল্লাহ ﷻ তার সব সন্তানকে তার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

"তিনি (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) বলতে লাগলেন, কিছুই না। এরা মনগড়া একটি কথা নিয়ে এসেছে, এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ ﷻ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন, তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৮৭]

ইয়াকুব ﷺ তার সব দুঃখকে আল্লাহ ﷻ-র সমীপেই পেশ করলেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ.

"তিনি বললেন, আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।"[৮৮]

ইয়াকুব ﷺ তার বুকে বয়ে যাওয়া কষ্টের কথা পৃথিবির কোনো ব্যক্তিকে প্রকাশ করেননি। নীরবে বুকে লালন করেছেন সন্তানহারা কষ্ট। পরবর্তীতে আল্লাহ ﷻ তার সব সন্তানকে তার ভালোবাসার পরশে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

প্রভুর সাহায্য কামনা করা

কষ্টের ঝড়ো হাওয়া বুকে বয়ে গেলে প্রভুর কাছেই আশ্রয় চাওয়া ও প্রভুর কাছে সাহায্য কামনা করা হলো সবরের সিঁড়িতে পা রাখার অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ.

[৮৭] সুরা ইউসুফ : ৮৩।

[৮৮] সুরা ইউসুফ : ৮৬।

"আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না।"[৮৯]

ইবনে কাসির ﵀ বলেন, উপরোক্ত আয়াতে এমন সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, প্রভুর ইচ্ছা ছাড়া কখনো ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়, আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য অবশ্যই আবশ্যক। তাই ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে প্রভুর কাছে সাহায্য কামনা করা চাই।[৯০]

ধৈর্যকে সৌভাগ্য মনে করা

ধৈর্যের উপর নিজেকে স্থীর রাখার আরেকটি মাধ্যম হলো, কোনো বিপদ চলে আসলে সেটাকে সৌভাগ্য মনে করা। এমন বলা যে, এটা আমার কপালে প্রভুর পক্ষ থেকে এমনই লিখিত ছিলো তাই এমন হয়েছে। আর আল্লাহ ﷻ-র লিখন বা নির্ধারণকে কখনো ঠেকানো যায় না। আল্লাহ ﷻ-র বিধানকে কখনো কোনো কৌশলেও দূর করা যাবে না। তার লিখন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করা যায় না। তাহলে দেখবেন আপনার ভেতরে সবরের একটা সাহস আসবে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে–

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"পৃথিবিতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসেনা; বরং তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"[৯১]

কোনো মুসিবত আসলেই হৈ-চৈ, চিৎকার-চেঁচামেচি, জামা-কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা হলো একদম মূর্খতার পরিচয়। কারণ এগুলো করলে আপনার হারিয়ে যাওয়া কোনো কিছু আর ফিরে আসবে না এবং এসব করার দ্বারা কিছু অর্জিতও হবে না। নীরবে মুসিবতকে সহ্য করা হলো জ্ঞানীর পরিচয়।

[৮৯] সুরা নাহল : ১২৭।
[৯০] তাফসিরে ইবনু কাসির : ২/৭৮১।
[৯১] সুরা আল হাদিদ : ২২।

তাছাড়া এটাও তো বুঝা দরকার যে, এখনতো ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাহলে এসব করবো কেন? কিন্তু মূর্খরা বিপদের কোন কথা শোনা মাত্রই একেবারে হৈ-হুল্লোড় করা শুরু করে দেয়, যখন দেখে এগুলো করে কোনো লাভ নেই, তখন ধৈর্যধারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি সে এ ধৈর্যধারণটা প্রথম ধাক্কায় করতো তাহলে কত ভালো হতো..।

বিপদে ধৈর্যধারণের আরেকটি মাধ্যম হলো, অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে নেওয়া যে, আল্লাহ ﷻ বান্দাকে তার সালাহিয়্যাত বা ভারসাম্যতা অনুযায়ী মুসিবতে পতিত করেন।

সা'দ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো—'হে আল্লাহর রাসুল! সবচেয়ে বেশী কারা মুসিবতে পতিত হয়েছে?' তখন রাসুল ﷺ বলেন—সবচেয়ে বেশী মুসিবতে পতিত হয়েছেন নবিরা। এরপরে তার মতো যারা তারা। এরপরে যার ঈমান যত শক্তিশালী সে তত মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে থাকে, তাহলে সে কঠিন মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা থাকে, তাহলে সে অনুযায়ী মুসিবতে পতিত হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট, মুসিবত বান্দার সাথে থাকবেই। বান্দা থেকে কষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ সে দুনিয়ার জমিনে চলাফেরা করে।[৯২]

বড়দের ধৈর্যধারণের গল্প শোনো

পূর্ববর্তীদের ধৈর্যধারণের কথা স্মরণ করলেও তোমার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাবে।

নূহ عليه السلام-এর ধৈর্য

নূহ নবি তার জাতিকে প্রায় সাড়ে নয়শত বছর আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু তার জাতি তার কথা শুনেনি। তবুও তিনি তাদের হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে দ্বীনের পথে ডেকেছিলেন অবিরত। তার জাতি তাকে কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খাইয়েছে। তবুও তিনি অধৈর্য হননি, পিছপা

---

[৯২] সুনানে তিরমিযি : ২৩৮৯।

হননি আল্লাহ ﷻ-র দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তার জাতি তাকে পাগল, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি অপবাদ দিয়েছে। ঐ জাতি এতই নির্দয় ও নিষ্ঠুর ছিলো যে, তারা পাপের দরিয়া থেকে একটুও ওঠেনি, বরং আরো অতলে ডুবে গেছে।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.

“তারা বললো, হে নূহ! যদি তুমি তোমার ঐসব কাজ থেকে বিরত না থাকো; তাহলে নিশ্চিত তুমি প্রস্তারাঘাতে নিহত হবে।”[৯৩]

কবি আবৃত্তি করেছেন-

সাড়ে নয়'শ বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াতে নূহ,
শত লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় বলেননি কভু উহ! [সংযুক্ত]

ইবরাহিম ؑ-এর ধৈর্য

ইবরাহিম ؑ হাজারো কষ্ট সহ্য করেছেন, তবুও তিনি আল্লাহ ﷻ-র পথে অবিরত দাওয়াত দিয়েছিলেন। কাফিররা চেয়েছে তার বুক থেকে ইসলামের দেদীপ্যমান আলো একেবারেই মুছে দিতে। তাঁর অপরাধ ছিলো তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী। একথা ইবরাহিম ؑ-এর অন্তর থেকে মুছে দিতে প্রজ্জলিত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করেছিল কাফিররা। তবুও তিনি অটল ছিলেন, তাকে বলা হলো মূর্তির সামনে সিজদা করতে; তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু না; তিনি এক কথায় জবাব দিলেন—না, কখনোই স্বহস্তে তৈরী মাটির প্রতিমার সামনে শির নত করবো না। আমি শির নত করব একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র সামনে।

“আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।”[৯৪]

৯৩ সূরা আশ শুআরা : ১১৬।
৯৪ সহিহ বুখারি : ৪২৮৮।

আল্লাহ ﷻ ইবরাহিম ﷺ-কে স্বীয় সন্তান ইসমাইলের মাধ্যমে পরীক্ষা করলেন। একদিন আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে আদেশ আসলো প্রিয় সন্তান ইসমাইলকে কুরবানি করতে হবে, ইবরাহিম ﷺ আল্লাহ ﷻ-র এ আদেশে সাড়া দিলেন। ইবরাহিম ﷺ-এর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এলো বিচ্ছেদের চিহ্ন। তবুও তিনি একটুও পিছপা হননি। সন্তানকে জমিনে রেখে ছুরি চালাতে শুরুও করেছিলেন। তিনি অধৈর্য হননি। অতঃপর রবের পক্ষ থেকে আদেশ আসলো হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রেখে চলে যেতে হবে। তিনি প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে ও প্রাণপ্রিয় ইসমাইলকে রেখে চলে গেলেন। ইবরাহিম ﷺ-এর কোন সন্তান ছিলে না। অনেক বছর পর আল্লাহ ﷻ শিশু ইসমাইলকে দান করলেন। নয়নের মনি ইসমাইলের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিলো। কিন্তু জীবনের সব কিছু তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন প্রভুর ভালোবাসায়। উৎসর্গ করেছেন স্ত্রী-পরিজন, ধন-সম্পদ। তবুও তিনি অধৈর্য হননি।

শিশু ইসমাইল ও প্রিয় বিবি হাজেরাকে সদূর ভূমিতে রেখে আল্লাহ ﷻ-র ডাকে সাড়া দিয়ে রওয়ানা করলেন ইবরাহিম ﷺ। চলার পথে প্রিয়তমা বিবি হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন-

'ওগো! আমাদেরকে এই জনমানবশূন্য জায়গায় রেখে কোথায় যাচ্ছো? এভাবে হাজেরা ﷺ কয়েকবার বললেন। কিন্তু ইরবরাহিম ﷺ সেদিকে তাকালেন না। তিনি চলছেন তো চলছেন। হাজেরা ﷺ ইবরাহিমকে জিজ্ঞেস করছিলেন—

"তোমাকে আল্লাহ ﷻ সেখানে যেতে আদেশ করেছেন?"

উত্তরে বুঝিয়ে দিলেন—'হ্যাঁ, আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ। (চলছি হে প্রিয়তমা, জানি না ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় তোমার সাথে আর দেখা হবে কিনা? চলছি হে প্রিয়তমা! আল্লাহ ﷻ-র রাহে।) তখন হাজেরা বললেন—তাহলে আল্লাহ ﷻ আমাদের অপদস্থ করবেন না। তিনি ধৈর্যধারণ করেন। শিশু ইসমাইলকে নিয়েই এই মরুভূমিতে বাস করতে লাগলেন। মায়ের মমতার আঁচলে শিশু ইসমাইলের জীবন চলছিলো নদীর স্রোতের মতো। এখন বিবি হাজেরাই তার মা, আবার হাজেরাই তার বাবা।

ইবরাহিম ﷺ শামের দিকে ফিরে এলেন। আল্লাহ ﷻ ইবরাহিমের ধৈর্যের কারণে তাকে বিবি সারা ও ইসহাক ﷺ-কে দান করলেন। আর আল্লাহ ﷻ হাজেরা ﷺ-এর ধৈর্যের কারণেই তাদের যমযম কূপসহ অসংখ্য নিয়ামত দান করলেন।

মুসা ﷺ-এর ধৈর্য

মুসা ﷺ তার জাতিকে একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন অনেক বছর। কিন্তু ঐ জাহান্নামের কীটগুলো মুসা নবিকে হাজারো কষ্ট দিয়েছিলো। তবুও তিনি তাদের কষ্টকে উপেক্ষা করে তাদেরকে এক আল্লাহ ﷻ-র পথেই ডেকেছেন। তিনি তাদের কষ্টের কাছে হেরে যাননি, অধৈর্যও হননি। ফেরআউন জাতিও তাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। তিনি তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন, অবশেষে আল্লাহ ﷻ এ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। এরপর বনি ইসরাইলরা খুব কষ্ট দিয়েছিলো, তাতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। অধৈর্য হননি একটুও।

রাসুল ﷺ যখন মাঝে-মাঝে নবিদের ধৈর্যধারণের কথা আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন, তখন মুসা নবির ধৈর্যধারণের কথা বলতেন।

يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.

"আল্লাহ তা'আলা মুসার প্রতি রহম করুন! তাকে এর থেকেও অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি কত কষ্ট সহ্য করেছেন।"[৯৫]

কবি আরো সুন্দর করে বলেছেন-

সয়েছে মুসা ফেরাউনজাতির কত অত্যাচার,
ধৈর্যের ফলে নীল নদ জলে রাস্তায় হলো পার। [সংযুক্ত]

ঈসা ﷺ-এর ধৈর্য

ঈসা নবিকে তার জাতি জারজ ইত্যাদি বলে কত কষ্ট দিয়েছেন। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো—ঈসা নবিকে

---

৯৫ সহিহ বুখারি : ৩৪০৫।

হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তার প্রিয় বন্ধু ঈসা নবিকে তার কাছে উঠিয়ে নিলেন।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধৈর্য

মক্কার জাহান্নামের কীটগুলো রাসুল ﷺ-কে কত কষ্ট দিয়েছে। ঐ জাতি রাসুল ﷺ-কে পাগল, জাদুকর, মিথ্যুক, ধোঁকাবাজসহ সব ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল, তবুও রাসুল ﷺ তাতে ধৈর্যধারণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বড় সত্যবাদী, সবচেয়ে বড় আমানতদারী। তার মতো সুন্দর ও উত্তম আদর্শের আর কোনো লোক পৃথিবিতে ছিলো না। তাদের কষ্টে রাসুল ﷺ তার মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যান দূর দেশ মদিনায়। ছেড়ে যান শিশু বেলার মক্কা। ছেড়ে যান সকল স্বজনদের। ঐ কাফিরগুলো তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

> وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
>
> "আর কাফেররা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দি বা আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য, যেমন ছলনা করেছিলো ঠিক তেমনি আল্লাহও তাদের সাথে ছলনা করেছে, বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।"[৯৬]

তায়েফে নরাধম কাফেরদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে পাথরের আঘাতে নবির শরীর মোবারককে রক্তে রঞ্জিত করেছিল ঐ জাহান্নামের কীটগুলো। উহুদ যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর দাঁত মোবারক শহিদ করে দিয়েছিলেন ঐ কাফেররা, তবুও তিনি বিনীত সুরে বললেন, ওরা বুঝে না। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েননি।

রাসুল ﷺ-এর অনেক সাহাবাকে হত্যা করেছেন ঐসব কাফিররা। আবার অনেক সাহাবায়ে কেরামকে নির্মম কষ্ট দিয়েছিল তারা। যখন সাহাবাদেরকে

---

[৯৬] সুরা আনফাল : ৩০।

রাসুল ﷺ-এর সামনে নির্মম কষ্ট দিত তখন তিনি খুব ব্যথিত হতেন, যা বলার মত নয়।

রাসুল ﷺ একবার ইয়াসির ও সুমাইয়া رضي الله عنهما-র পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন–

صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.

"হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্যধারণ করো তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।"[৯৭]

রাসুল ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় এসেও শান্তি পাননি। এখানেও মুনাফিকরা বিভিন্ন রকম কষ্ট দিয়েছে রাসুল ﷺ-কে। পূত-পবিত্র, সতী-সাধ্বী আয়েশা رضي الله عنها-কে যিনার অপবাদ দিলো ঐ মুনাফিকরা। মদিনার ইহুদিরা রাসুল ﷺ-কে বিষ খাওয়ালো। তবুও তিনি এসব চক্রান্তের ওপর ধৈর্যধারণ করেছিলেন। অটল ছিলেন দ্বীনের পথে। পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ ﷻ-র দাওয়াত।

সাহাবাদের ধৈর্য

কাফিরদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করেছেন আরো হাজারো সাহাবায়ে কেরাম, কাউকে একেবারে দুনিয়া জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছে মক্কার কাফিররা। আবার কাউকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়েছেন ঐ নরাধম জাহান্নামের কীটগুলো। বিলাল, সুমাইয়্যা, সুহাইব, আম্মার, মিকদাদ رضي الله عنهم সহ সকলকে হাজারো কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তবুও তারা অধৈর্য হয়ে দ্বীনের পথকে ছেড়ে যাননি। তাদের একজন হলেন খুবাইব رضي الله عنه।

খুবাইব رضي الله عنه

প্রিয় পাঠক! খুবাইব رضي الله عنه-কে শহিদ করার ঘটনাটি ছিলো খুবই নির্মম। তাই একটু বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো, এ ঘটনাটি মূল বইতে বিস্তারিত নেই। (অনুবাদক)

---

[৯৭] মুসতাদরাকে হাকিম : ৫৬৬৬।

মূল ঘটনা ছিলো খুবাইব ﷺ-কে এক যুদ্ধে বন্দি করে এনেছিলো কাফিররা। অনেকদিন তাদের কাছে বন্দি থাকার পরে তারা তাকে হত্যা করার মনস্থ করলো। কিন্তু এইসব কাফেররা তাকে অনেক কষ্ট দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা করেছে। একদিন হত্যার জন্য তাকে উন্মুক্ত মাঠে নিয়ে আসা হলো।

তখন জাহান্নামের কীটগুলো হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে উপহাস করছিলো। হযরত খুবাইব ﷺ-কে শিকলে বেঁধে হাজির করা হয়েছে। উম্মুক্ত খোলা মাঠ: অজস্র তীরন্দাজ ধনুকে তীর গেঁথে দাঁড়িয়েছিলো চর্তুদিকে। শূল প্রস্তুত; আনন্দে মেতে উঠেছিলো কাফিররা। ঘটনাস্থলে হাজার মানুষের ভীড়। খুবাইব ﷺ-র কোন ভয় নেই। ইসলামের জন্য নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

প্রথমে খুবাইবের অঙ্গ-প্রতঙ্গ একেক করে কাটা হবে। তারপর শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়ালেন খুবাইব ﷺ। কাফিরদের কাছে কিছু সময় চাইলেন, জীবনের এই শেষ মূহুর্তে পরম প্রভুর সমীপে অবনত মস্তক নিবেদন করার জন্য। প্রেম নিবেদন করবেন প্রেমময় প্রভুর সাথে। হতভম্ব হয়ে গেলো কাফিররা। খুবাইব ﷺ ইসলামের জন্য জীবন দান করবেন বলে মহা খুশী। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েননি। অনুমতি দিলেন কাফিররা; মাত্র দু'রাকাত সালাত। আর বেশী সময় নয়। কাফিররা ধমকের সুরে বললো-

“যাও, তোমার আল্লাহ ﷻ-র সাথে কথা বলো।”

সালাতে দাঁড়ালেন তিনি। অনুমতি নেয়া সময়টুকুকে নিবেদন করলেন প্রভুর নিকট। মনে খুশির ঢেউ। সালাত শেষ করার পর কাফিরদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রোহী কণ্ঠে বললেন–

“আমি দু'রাকাতের চেয়েও আরো বেশী সময় নিতাম—কিন্তু নেইনি। কারণ তোমরা মনে করতে পারো আমি মৃত্যুঁকে ভয় করি। আমি কখনো এই নির্মম মৃত্যুকেও ভয় করি না।”

এরপর তাঁদের দিকে শক্ত কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। তাঁর সেই কবিতা সাহসি, কালজয়ী। জানি সে কবিতার আসল উদ্দেশ্য অনূদিত ভাষায় কখনই বুঝানো যাবে না। তবুও....

নেই কোন পরওয়া আমার,
আমিতো কেবল মুসলমান।
হাজারো কষ্ট হোক না আমার,
এ জীবনতো প্রেমময়ের জন্যই দান।
যদি চায় আমার প্রেমময় প্রভু,
প্রত্যেক কর্তিত অঙ্গে করবে বরকত দান।[৯৮]

আর দেরী নয়, শুরু হলো খুবাইব ﵁-র উপর ইতিহাসের নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতন। একেক করে কাটা হচ্ছে খুবাইবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। রক্তের ঝর্ণা যেন শত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলছে। তবুও তিনি স্থির, অবিচল ছিলেন ইস্পাত লোহার মতো। তারপর শুরু হলো তীর নিক্ষেপ। চতুর্দিকের তীরন্দাজের নিক্ষিপ্ত তীর ঝাঁকে-ঝাঁকে আসতে লাগলো। বৃষ্টির মতো বিদ্ধ হতে লাগলো তার স্বচ্ছ গায়ে। আহ! কী নিষ্ঠুরতা! আসলে এরাতো আদতে কোন মানুষ নয়। বাস্তবে পশু। তাই এরকম পশুর মত আচরণ তাদের দ্বারাই সম্ভব। কারণ ঈমানের আলো দ্বারা আলোকিত নয় এই পশুগুলোর হৃদয়। তাদের নির্মম, বর্বর আচরণ দেখে নিরবে কাঁদলো আকাশ। থমকে দাঁড়ালো বাতাস।

খুবাইব ﵁ আকাশের দিকে তাকান, বিনীতসুরে ফরিয়াদ জানান রবের কাছে—হে আল্লাহ ﷻ! এখানের সবাই আমার শত্রু। কেউ আমার আপন নয়, বন্ধু নয়, প্রিয় নয়। আমার শেষ সালামটুকু আপনার প্রিয় বন্ধু প্রিয়নবি রাসুল ﷺ-কে পৌঁছে দিন।

ধীরে-ধীরে ঢলে পড়লেন খুবাইব। নিস্তেজ হয়ে গেলো তাঁর দেহ। এখানেই ক্ষান্ত নয়। পাষণ্ড, হৃদয়হীনরা তাঁর কর্তিত লাশকে শূলে ঝুলিয়ে রাখলো। আর নামালো না। রাসুল ﷺ তখনও মদিনায়। বসে আছেন আলোর আসরে। সাহাবায়ে কেরাম ﵃-কে সামনে নিয়ে। ওহি আসলো। হযরত জিবরাঈল ﵇ বললেন—হে আল্লাহর রাসুল! পিয়ারা হাবিব! আপনার প্রিয় সাহাবা খুবাইব শহিদ হয়েছেন এবং তাঁর সাথে আরো কয়েকজন। তাঁকে শূলে চড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে; শহিদ হওয়ার সময় খুবাইব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। রাসুল ﷺ তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। পুরো ঘটনা খুলে বললেন সাহাবায়ে কেরামকে। কষ্টে হাহাকার করে উঠলো

[৯৮] সহিহ বুখারি : ৩৯৮৯।

রাসুল ﷺ-এর বুক। দুঃখের পতাকা পত্পত্ করে উড়তে লাগলো তার হৃদয়াকাশে। কেঁদে উঠলো তার অন্তর। দুঃখে রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের বুকের জমিন চৌচির হলো। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। কান্নার ঢেউ প্রবাহিত হতে লাগলো তাঁদের গাল বেয়ে। কষ্টে তাদের ভেতরটা ভেঙ্গে যায়। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কষ্টের টুকরোগুলো এক-এক করে জমা হতে থাকে তাদের হৃদয়ে। কষ্টের ঝড়ে হৃদয়ে প্লাবন তোলে। দু'চোখে বয়ে চললো অশ্রুনদী। রাসুল ﷺ তাদেরকে শান্তনা দিলেন। কখনো ভেবে দেখেছেন বড়দের ধৈর্যধারণের ব্যাপারে।

তাবেঈনদের ধৈর্য

ওরওয়া বিন যুবাইর রহ.-র ধৈর্য

ওরওয়া বিন যুবাইর রহ.। তিনি ছিলেন তাবিঈনদের অনেক বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তার একজন আদরের সন্তান ছিলো অনেক সুন্দর ও সুদর্শন। নাম মুহাম্মাদ। সে একদা ওয়ালিদের দরবারে গেলেন। তখন ওয়ালিদ আশ্চর্য হয়ে বললো, কুরাইশের ছেলেরা এত সুন্দর হতে পারে! ওয়ালিদ তার জন্য সামান্য বরকতের দোয়াও করলো না। অতঃপর ওয়ালিদের বদনযর তার ওপর লেগে গেল। এরপরে মুহাম্মাদ বিন ওরওয়া সেখান থেকে বের হয়ে বাড়ি ফিরছিলো। ঠিক তখনি সে সওয়ারির আস্তাবলে পড়ে গেলো। আর উঠতে পারেনি। ততক্ষণে সওয়ারীগুলো তাকে পিষ্ঠ করে মেরে ফেললো।

এরপরে ওরওয়া রহ.-র পায়ে ক্যান্সার হলো। ডাক্তার যা বললো তা ছিলো ভয়ানক। ডাক্তাররা বললো, তার পায়ে অস্ত্রপাচার করা হবে। নয়তো বিষের ক্রিয়া শরীরের অন্য জায়গাতেও সংক্রমিত হতে পারে। ডাক্তাররা তাই করতে শুরু করলো, অপারেশনের সময় যখন ছুরি ওরওয়া রহ.-র হাঁড়ে গিয়ে পৌছলো; তখন তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। সেসময় তার চেহারা থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিলো, তখনও তিনি "লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর যিকির করতে ছিলেন।" (সুবহানাল্লাহ! কত ধৈর্যধারণ করেছেন।)

অতঃপর ওরওয়া ছেলেকে কাছে টেনে বললেন, আজ তোমার আর আমার ওপর যে কষ্ট এসেছে তা আল্লাহ ﷻ-র পরীক্ষা। আল্লাহ ﷻ জানেন, আমি তোমাকে নিয়ে কখনো আল্লাহ ﷻ-র অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ ও পাপের দিকে রওয়ানা হইনি। অতঃপর তার সন্তানকে গোসল ও কাফন-দাফনের

ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। এরপরে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যেতে বললেন। দাফন সম্পন্ন করে ফেরার পথে—যখন কিনা তার মনে অনেক কষ্ট, একদিকে সন্তানহারা কষ্টের পতাকা হৃদয়াকাশে উড়ছে, অপরদিকে তার একটি পা কেটে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বললেন—আজকের এ সফর আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। যখন অপারেশনের ডাক্তাররা তাকে বললো, আপনাকে এমন কোনো ওষুধ দেওয়া হবে—সেটা পান করলে আপনি আর ব্যাথা পাবেন না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ ﷻ আমাকে মুসিবতের মধ্যে ফেলেছেন আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ও আমার ধৈর্যকে দেখার জন্য।[৯৯]

সালাফদের ধৈর্য

এরকমই ধৈর্যধারণের পথে হেঁটেছেন আমাদের আসলাফগণ। ধৈর্যধারণের সিঁড়ি বেয়ে তারা চলে গেছেন জান্নাতের সুখময় উদ্যানে। কখনো তারা অধৈর্য হননি। জালেমদের জুলুমকে সহ্য করেছেন তারা।

আহমাদ বিন নছর রহ.-এর ধৈর্য

সালাফদের বড় ব্যক্তি আহমাদ বিন নছর রহ.। সদা সত্য কথা বলতেন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে কখনো তিনি ভয় পেতেন না। তিনি খলকে কুরআনের মাসাআলায় ইস্পাত লোহার মতো শক্ত ছিলেন। সে কারণে তার মস্তককে দু-খন্ড করা হয়েছে। এক খন্ড বাগদাদের এক প্রান্তে; অপর খন্ড অপর প্রান্তে রাখা হয়েছে। তবুও তিনি ছিলেন স্থির, ভেঙ্গে পড়েননি ক্ষণিকের জন্যও। শহিদি অমৃত শুধা পানে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। কখনো আল্লাহ ﷻ-র রাহে অধৈর্য হননি। শহিদি মিছিলে তার প্রাণ পাখি উড়ে যাওয়ার সময় তিনি আল্লাহ ﷻ-কে ভুলে যাননি। তার জীবনের শেষ বাক্যটি ছিলো—"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।"

জাফর বিন মুহাম্মাদ আস সায়েগ রহ. বলেন, আমি আহমাদ বিন নছর আল খুজাঈ রহ.-কে মৃত্যুর সময় দেখেছি। তিনি মৃত্যুর সময় বলেছিলেন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

---

[৯৯] সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৭৮।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বলেন, আহমাদ বিন নছর ﷺ আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।[১০০]

আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর ধৈর্য

সালাফদের আরেকজন ব্যক্তি হলো আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ। খলিফা মামুন প্রথমে মহাম্মাদ বিন নুহ ﷺ-কে বন্দি করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাকে বন্দি করে খলিফার দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-কে অসিয়ত করে গেলেন, যেন তিনি খলকে কুরআনের মাসাআলার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। এরপর মুহাম্মাদ বিন নুহ ﷺ রাস্তাতেই এ ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানার সমস্ত লেনদেন চুকিয়ে পাড়ি জমান পরপারে।

এবার ইমাম আহমাদের পালা। খলকে কুরআনের মাসালায় খলিফার মতের বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-কে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসা হলো খলিফার দরবারে। লোকেরা ইমাম আহমাদকে খলকে কুরআনের ব্যাপারে ফতোয়া পরিবর্তন করতে বললেন, কিন্তু আহমাদ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি খাব্বার ﷺ-র ধৈর্য সম্পর্কে জানো না?

হযরত খাব্বাব ﷺ একদা রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললো—হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কষ্ট ও দুঃখের ব্যাপারে আপনি আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করুন; যাতে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এ কথার উত্তরে রাসুল ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কথা কি ভুলে গেছো? তোমাদের পূর্বে এমন লোক অতিবাহিত হয়েছে; যাদেরকে জমিনে কূপ খনন করে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অতঃপর তাকে এনে করাত দিয়ে তার মাথাকে দু'খন্ড করা হয়েছে। তবুও তাকে দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। এমনিভাবে লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীরের গোস্তকে আঁচড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবুও সে ব্যক্তি ইমানের উপর অটল ছিলো। কোন নির্যাতনই তাকে দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি।"[১০১]

---

[১০০] তারিখে বাগদাদ : ৫/১৭৭।

[১০১] সহিহ বুখারি : ৩৬১২।

সে কষ্টকে সহ্য করে তাতে ধৈর্যধারণ করেছে। ইমাম আহমদের এরকম জ্বলন্ত বক্তব্য শুনে লোকেরা তাকে নসিহত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে চলে গেলেন।

ইমাম আহমাদ ﵀ আল্লাহ ﷻ-র দরবারে মুনাজাতে বলেছিলো, "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খলিফা মামুনের চেহারা দেখাবেন না।"

আল্লাহ ﷻ তার দু'আকে কবুল করে নিয়েছেন। ব্যস, সাথে-সাথেই খলিফা মামুন এই লোভাতুর দুনিয়া ত্যাগ করলেন, সে আর ইমাম আহমাদ ﵀-কে চেহারা দেখাতে পারেনি। তারপরের খলিফা নিযুক্ত হলো। লোকেরা আহমাদ ﵀-কে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিচ্ছিলো—মুহতারাম! খলকে কুরআন তথা "কুরআন সৃষ্ট" এরকম ফতোয়া প্রদান করে এই জালেম বাদশাহ থেকে মুক্তি পেয়ে যান। আপনি তো জানেন এ বাদশাহ খুব খারাপ মানুষ। আপনাকে সে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ ﵀-এর বুকে ছিলো ইমানের হিমালয়। তিনি একদম শক্ত ছিলেন, হৃদয়ে গেঁথেছেন ধৈর্যের খুঁটি। তিনি লোকদের কোনো কথাই শুনলেন না।

একদিন খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলো—'বেটা! তুমি বোধ হয় আমাকে ভালো করে চিনতে পেরেছো? আমি কিন্তু সালেহ আর রশিদকে হত্যা করেছি। সে আমার অনুগামী ছিলো না। এই খলকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে এর উল্টো জবাব দিয়েছিলেন, তাই তাকে হত্যা করেছি। এবার তাহলে বলো খলকে কুরআনের মাসআলায় তোমার মতামত কি? ইমাম আহমাদ ﵀ বললেন, আমি কুরআনকে "মাখলুক বা সৃষ্ট" বলবো না। অতঃপর শুরু হলো নির্দয় আচরণ। জল্লাদ চাবুকের আঘাতে আহমাদ ﵀-কে রঞ্জিত করতে লাগলো। কিল, ঘুষি, লাথি যে যেমন পারছে দিচ্ছে। তারপর সব জল্লাদরা তাকে তিরস্কার করতে লাগলো। ওরা মারতে মারতে ক্লান্ত আর আহমাদ ﵀ ধৈর্যধারণ করে যাচ্ছেন অবিরত। কী নির্মম দৃশ্য। সহ্য করার মত না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀ হয়ে পড়লেন জীবন্ত মরা লাশ।

খলিফা ইমাম আহমাদ ﵀-কে বললো, তুমি নিজেকে হত্যা করে ফেলে দিয়ো না। তুমি শুধু বলো যে, কুরআনুল কারিম "সৃষ্ট" তাহলে তোমাকে এ কষ্ট থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন জল্লাদ তলোয়ার নিয়ে

আহমাদ ﷺ-র মাথার কাছে গিয়ে বললো—হে আহমাদ! তুমি ধ্বংস হও। তুমি এমন জবাব দাও, যাতে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু না, তিনি খলকে কুরআনের মাসায়ালায় ছিলেন ইস্পাত লোহার মতো শক্ত। তিনি উত্তরে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! তাহলে আপনার মতের স্বপক্ষে কেবল একটা দলিল দেখান। তাহলে আমি সব মেনে নিব। এরপরই এক জল্লাদ আবারো মারতে শুরু করলো। চামচাদের থেকে একজন বলে উঠলো, ওর চেহারাকে উল্টো করে রাখো ও শরীরকে মাটিতে বিছিয়ে দাও, আমরা পদদলিত করবো। তবুও ইমাম আহমাদ ﷺ বলেন, না, আমার কোন ভয় নেই। অতঃপর ইমাম আহমাদ ﷺ অনেক কাল কারাগারে বন্দি ছিলেন। প্রায় আটাশ মাস পর্যন্ত বন্দি ছিলেন।

সালাফদের একজন বলেছিলেন, ইমাম আহমাদ ﷺ নিজের জীবনকে দ্বীনের রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যেমন বেলাল হাবশি ﷺ নিজের জীবনকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছেন। যদি ইমাম আহমাদ ﷺ না হতো তাহলে দ্বীন চলে যেত।[১০২]

প্রিয় বন্ধু! তুমি যদি বড়দের ধৈর্যধারণের কথা একটু স্মরণ করতে পারো, তাহলে তোমার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে। সুতরাং তুমি যদি ধৈর্যধারণ করে দ্বীনের পথে হাঁটতে পারো, তাহলে তুমি সফলতা পাবেই ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ ﷻ তোমাকে মদদ করুন। আমিন।

এগুলো করবেন না

সব কাজ পূরণ হতেই কিছু না কিছু বাঁধা থাকে। তাই সব কাজ পূরণ করতে হলে সেসব কাজ না করা চাই। ঠিক তেমনি ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সুতরাং ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যেগুলো বাঁধা প্রদান করে সেগুলো করবেন না। তাহলেই দেখবেন আপনার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাচ্ছে।

---

১০২ হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/১৭১-২০৩।

তাড়াহুড়া করবেন না

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যাবে না। কেননা মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই মানবজাতি সবক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতে পছন্দ করে। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে–

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ.

"নিশ্চয় সৃষ্টিগতভাবে মানুষ তড়িৎপ্রবণ।"[১০৩]

যদি ধৈর্যধারণ করা হয় তাহলে ফল ভোগ করবে অন্যথায় ধৈর্যের ফল পাওয়া যাবে না। প্রিয়তম প্রভু আল্লাহ ﷻ তার প্রেমময় বন্ধুকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন। আর পূর্ববর্তী নবিরা যেমন কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন, ঠিক ওভাবে আপনিও ধৈর্যধারণ করুন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ.

"হে নবি! আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন পূর্ববর্তী সাহসী পয়গম্বরগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। আপনি কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না।"[১০৪]

রাগ করবেন না

ধৈর্যধারণের ফল পেতে হলে আপনাকে রাগ না করা থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। কেননা রাগ হলো ধৈর্যধারণের বিপরীত কাজ। তাই রাগ না করা চাই। যদি কোনো কষ্টে আক্রান্ত হওয়ার পরও রাগ না করে থাকেন, তবেই আপনি পাবেন ধৈর্যধারণের ফল। আল্লাহ ﷻ তার প্রিয় বন্ধু রাসুল ﷺ-কে রাগ করতে নিষেধ করেছেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে–

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ.

---

[১০৩] সুরা আম্বিয়া : ৩৭।

[১০৪] সুরা আহকাফ : ৩৫।

"আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করছিলো।"[১০৫]

নিরাশ হবেন না

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, কোনো বিপদ আসলে নিরাশ না হওয়া। তাই তো ইয়াকুব ﷺ তার সন্তানদেরকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ.

"বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"[১০৬]

ধৈর্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাতিকে জ্বালিয়ে দেয়। ধৈর্যধারণ করা হলো নিরাশ না হওয়ার ঔষধ। আর যে নিরাশ হয় না, আল্লাহ ﷻ কখনো তার আশাকে অপরিপূর্ণ রাখেন না। অবশ্যই আল্লাহ ﷻ দুখের পরে সুখ দান করবেন।

শেষ কথা

রাসুল ﷺ আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন যখন আমরা কষ্টে নিপতিত হই। আবি সালাবা খুশানী ﷺ বলেন, রাসুল ﷺ বলেন- "তোমাদের সামনে সবরের দিন আসবে। সেই দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের উপর পা রাখার মতো। সে সব ফিতনায় ধৈর্যধারণকারীর আমল তোমাদের পঞ্চাশজন ব্যক্তির আমলের সমান হবে।"[১০৭] (যে ব্যক্তি ঐসব ফিতনায় ধৈর্যধারণ করবে, সে ফিতনাহীন ব্যক্তির দশগুণ সওয়াব পাবে)।

---

[১০৫] সুরা আল কলম : ৪৮।

[১০৬] সুরা ইউসুফ : ৮৭।

[১০৭] সুনানু আবু দাউদ : ৪৩৪১।

প্রিয় বন্ধু, রাসুল ﷺ উপরোক্ত হাদিসে বলেছেন, তোমাদের মাঝে এমন দিন আসবে সেদিন কেবল ধৈর্যধারণকারীরা আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রিয় হবে। আর যে ঐ দিনগুলিতে ধৈর্যধারণ করবে, তার নাম হবে "ধৈর্যধারণকারী"। সুতরাং তোমার জীবন নদীতে কষ্ট আসলে তুমি ধৈর্যধারণ করবে।

কবি আবৃত্তি করেছেন-

বুকে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক করিও সবর,
পাবে তুমি এর প্রতিদান হবে জান্নাতে ফসল।[১০৮]
যুগে-যুগে যত মনিষী ধৈর্য সাধনা করে
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে জাতি-সভ্যতার উপরে।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিতেন। আগত সকল প্রজন্মকে তারা বিপদের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করতেন। হুযাইফা رضي الله عنه বলেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, কেননা অচিরেই তোমাদের বিভিন্ন মুসিবতে পড়তে হবে।[১০৯]

কবি আরো আবৃত্তি করেন-

প্রার্থনা করছি তোমার কাছে সবরে ফেলো না মোদের,
তোমার সন্তুষ্টি করছি কামনা সেটাই চাওয়া মোদের।
ধৈর্যধারণের মাধ্যমে হেদায়েতের পতাকার নিচে দিয়ো মোদের ঠাঁই,
কতেক মানুষ মজবুত রয়েছে কেবল ধৈর্যধারণের ফলে।[১১০]

পূর্বেকার বুযুর্গরা মৃত্যুর সময় তাদের সন্তানাদিকে ধৈর্যধারণের অসিয়ত করে যেতেন। লোকমান হাকিম তার সন্তানকে দ্বীনের পথে হাজারো বাঁধা আসলে তাতে ধৈর্যধারণের অসিয়ত করে গেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে–

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

---

[১০৮] নাশরুতি আত তারিফ : ৮৭।
[১০৯] শুআবুল ইমান : ৯৭২০। আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান : ১৭।
[১১০] তাবয়িনুল কাযবিল মুফতারি : ২৯১।

"হে প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।"[১১১]

আজকাল আমাদের অবস্থা খুবই কঠিন। শত্রুরা চারদিক থেকে ওঁৎ পেতে আছে। ঈমান ও তাকওয়া দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন শোনা যায় মাজলুমের কান্না। প্রকৃতিকে ভারী করে নির্যাতিত মায়ের করুণ আর্তনাদ। চারদিকে পাপ আর পাপ। মুনাফিকিতে ভরে গেছে পুরো পৃথিবি। এখন আমাদের ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের ওপর। ধৈর্যধারণ করতে হবে সব পতিত কষ্টের ওপর।

প্রিয় বন্ধু! ধৈর্যের পথ অনেক বড়। আদম ﷺ শত বছর কেঁদেছিলেন ধৈর্যধারণ করে। নূহ ﷺ সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াতের কাজে ধৈর্যধারণ করেছে। ইবরাহিম ﷺ-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। ইসমাইল ﷺ-কে জবেহ করার জন্য মাটিতে শোয়ানো হয়েছে। যাকারিয়া ﷺ-কে করাত দিয়ে টুকরো করা হয়েছে, তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। ইয়াহইয়া ﷺ-কে হত্যার জন্য ঘেরাও করা হয়েছিলো। আইয়ুব ﷺ-এর দেহে পোকা-মাকড় বাসা বেঁধেছে। দাউদ ﷺ কেঁদে-কেঁদে ধৈর্যধারণ করেছেন। প্রিয়নবি ﷺ-কে পাগল, জাদুকর, মিথ্যুক বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দান্দান মোবারক শহিদ করা হয়েছে। মাথাকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে। তবুও রাহমাতুল্লিল আলামিন ধৈর্যধারণ করেছেন। বীর বাহাদুর ওমর বিন খাত্তাব ؓ-কে অভিযুক্ত করে শহিদ করা হয়েছে। ইবনুল মুসায়্যিব ؒ, মালেক ؒ তাদেরকে হাজারো কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাদের ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ন্তর ছিলো না।

একটু অন্যভাবে অনুবাদ করে যদি বলি—

ধৈর্য ধরে আদম কাঁদিলেন সাড়ে তিন'শ বছর,
তারপরে ক্ষমায় শুচি হলো আদমের অন্তর।
সাড়ে নয়'শ বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াতে নূহ,
শত লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় বলেননি কভু উহ।
মাছের পেটে ইউনুস নবি চল্লিশটি দিন ধরে,
তাসবিহ-তাহলিল পড়েছিলেন এক আল্লাহর উপরে।

---

[১১১] সুরা লোকমান : ১৭।

আইয়ুব নবির সর্ব গায়ে পোকার বসতি,
ধৈর্য ধরেছে শত বছর সেবায় রহিমা সতী।
করাতের আঘাতে দেখ দেহ হইলো দুই ভাগ,
প্রভু হতে যাকারিয়া পেয়েছিলেন ধৈর্যের ডাক।
সয়েছে মুসা ফেরাউন জাতির কত অত্যাচার,
ধৈর্যের ফলে নীল নদ জ্বলে রাস্তায় হলো পার।
তপ্ত আগুনে ইবরাহিম শিক্ত তা সকলে জানি,
কত ধৈর্য কত প্রেমের ফসল পুত্র কুরবানি।
প্রতিক্ষায় ইয়াকুব নবি দিলেন ধৈর্যের পরীক্ষা,
ধৈর্যের মাঝে ইউসুফ দিলেন ত্যাগেরই শিক্ষা।
কত ধৈর্য কত সহ্য কত মহানুভবতা হলে,
শত আঘাতে তাদের জন্য দোয়ায় হাত তুলে।
ধৈর্য ধরে সইলেন মুহাম্মাদ আঘাত অপমান,
ধৈর্যের ফলে বিশ্ব মাঝে আজকের মুসলমান।

বন্ধু একটু ভেবে দেখুন! ধৈর্যধারণ করা তোমার উপর অনেক কঠিন হবে, তবুও তোমাকে হাজারো কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করতে হবে, অধৈর্য হলে হবে না। গুনাহ না করে তাতে ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ জাহান্নামের আগুনের ওপর ধৈর্যধারণ করা থেকে। আখেরাতের ময়দানে জাহান্নামের শিকলে বন্দী হওয়ার থেকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ। কতই না উত্তম ধৈর্যধারণের স্থান। আর কতই না উত্তম চরিত্র ধৈর্যধারণের চরিত্র। আসুন আমরা সবাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে হাজারো কষ্ট আসলেও তাতে ধৈর্যধারণ করে জান্নাতের পথ সুগম করি। সবশেষে রবের দরবারে হাত তুলে বলি–

হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি আমাদের জন্য সবরের রাস্তা খুলে দিন।

হে প্রেমময় প্রভু! আপনি আমাদেরকে তাদের দলে অর্ন্তভুক্ত করে দিন, যারা কষ্টের অকূল দরিয়ায় পতিত হয়েও তাতে ধৈর্যধারণ করেছে।

হে আমাদের রব! আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে প্রবেশ করিয়ে দিন যারা সঠিক পথ পেয়েছে, যাদের জন্য সোজা রাস্তা সুস্পষ্ট রয়েছে।

ওগো আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে পথ প্রদর্শন করুন যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে ধৈর্যধারণ করেছে। ওয়াখিরী দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

সমাপ্ত

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-
"হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"
[সুরা বাকারা: ১৫৩]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন-
"ঈমানদারদের জীবন ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয় তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ ও তাদের পাপকে মোচন করানোর জন্য। কারণ ঈমানদারগণ তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কেবল রবের সন্তুষ্টির জন্য করে। তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার দেয়া রবের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।"
[মাজমু'উল ফাতাওয়া : ১৮/২৯১]

পথিক প্রকাশন
১১/১ ইসলামি টাওয়ার (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রিত মূল্য : ১৬০/-